আলোচনা।

শিরবিন্দুনাথ ঠাকুর গ্রন্থীত।
উৎসর্গ।

এই গ্রন্থ গীতিকারের শীর্ষকে উৎসর্গ করিলাম।

গীতিকার।
<table>
<thead>
<tr>
<th>বিষয়</th>
<th>পৃষ্ঠা</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ভূব দেওয়া।</td>
<td>1-38</td>
</tr>
<tr>
<td>ছোট বড়</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>ভূবিবার ক্ষমতা</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>ভূবিবার স্থান</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পুরাতনের নূতনত্ব</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>সাম্য</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>স্থদেশ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>কেন</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>এক কাঠা জমি</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>জগৎ মিথ্যা</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>তুলনায় অরুচি</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>জগৎ সত্য</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রেমের শিক্ষা</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>39-63</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রেমের যোগ্যতা</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পথ</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>পাপ পুণ্য</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>চেতনা</td>
<td>...</td>
</tr>
<tr>
<td>বিষয়</td>
<td>পৃষ্ঠা</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>অচৈতন্য</td>
<td>৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশ্বতি</td>
<td>৪৪</td>
</tr>
<tr>
<td>অগতের বিচ্ছন</td>
<td>৪৬</td>
</tr>
<tr>
<td>অগতের বিচ্ছন</td>
<td>৪৯</td>
</tr>
<tr>
<td>উদাহরণ</td>
<td>৫০</td>
</tr>
<tr>
<td>সচেতনতা</td>
<td>৫১</td>
</tr>
<tr>
<td>অপকাট</td>
<td>৫৩</td>
</tr>
<tr>
<td>সকলের অন্ধকার</td>
<td>৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>রোদ ও আত্মা</td>
<td>৫৫</td>
</tr>
<tr>
<td>মৃত্যু</td>
<td>৫৭</td>
</tr>
<tr>
<td>অগতের সহিত ঐক্য</td>
<td>৫৭</td>
</tr>
<tr>
<td>মূল বিচ্ছন</td>
<td>৫৯</td>
</tr>
<tr>
<td>একটি রূপক</td>
<td>৬০</td>
</tr>
</tbody>
</table>

সৌন্দর্য্যা ও শ্রেষ্ঠ ৬৪—৯৮

<table>
<thead>
<tr>
<th>সৌন্দর্য্যা ও শ্রেষ্ঠ</th>
<th>৬৪—৯৮</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>সৌন্দর্য্যার কারণ</td>
<td>৬৪</td>
</tr>
<tr>
<td>সৌন্দর্য্য বিষণ্যমী</td>
<td>৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>মনের মিল</td>
<td>৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>উপযোগিতা</td>
<td>৬৯</td>
</tr>
<tr>
<td>আমরা সুন্দর</td>
<td>৬২</td>
</tr>
<tr>
<td>সুন্দর ঐক্য</td>
<td>৭১</td>
</tr>
</tbody>
</table>
বিষয়

স্নায়ুর সুন্দর করে ... ৭২
শান্তি ... ৭৩
উদার ... ৭৪
কবির কাঙ ... ৭৫
কবিতা ও তত্ত্ব ... ৭৬
তত্ত্বের বার্ষিক্য ... ৭৮
নৌদর্শনের কাঙ ... ৮০
স্বাধীনতার পথ প্রদর্শক ... ৮২
পুরাতন কথা ... ৮৪
জ্ঞান ও প্রেম ... ৮৫
নগদ কবি ... ৮৬
অংশিক ও সম্পূর্ণ অধিকার ... ৮৭
লক্ষ্য ... ৮৯

কথার্থনা ৯২—১০২

নথ্যাবেলায় ... ৯২

আন্ত্র ১০৩—১২০

আত্মগুণ ... ১০৩
আত্মার সীমা ... ১০৫
মানব চেনা ... ১০৮
শ্রেষ্ঠ অধিকার ... ১১২
বিষয়

নিকট আত্মা .......................... ১১৪
আত্মার অমরতা ......................... ১১৫
স্বামিভ ................................. ১১৮

বৈষ্ণব কবির গান ১২১-১৩২

মর্ষের দীৰ্ঘানা ........................ ১২১
মিলন ..................................... ১২৩
স্বর্গের গান ............................. ১২৪
মর্ষের বাতায়ন ......................... ১২৪
সাড়া ..................................... ১২৬
সৌদর্য্যের ধৰ্ম্ম ....................... ১২৬
জ্ঞানদাসের গান ........................ ১২৯
বাঁশীর স্বর ............................ ১৩০
বিপরীত ................................ ১৩২
ছোট বড়।

ভুবিয়া যাওয়া কথাটাই সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু ভুবিয়া মরিবার ক্ষমতা ও অধিকার কয়জনের লোকেরই বা আছে! কথাটার প্রকৃত ভাবই বা কে জানে! কবিরা, যাবুকেরা, ভক্তেরা কেবল বলেন ভুবিয়া যাও, ইতর লোকেরা চারিদিকে চাহিয়া কঠিন মাঠিতে পা দিয়া অবাক হইয়া বলে, ভুবিয়া কোনু খানে, ভুবিয়া স্থান কোথায়!
জ্ঞানিয়া অবশেষে যখন শ্রান্ত হইয়া সমুদয় জ্ঞান-শৃঙ্খলকে অতি বৃহৎ স্তূ পাপকৃতি করিয়া তুলা গেল তখনও দেখা গেল বালির শেষ হইল না। অতএব নিতান্ত জড়ভাবে না দেখিয়া মানসিক ভাবে দেখিলে বালুকাগার আকার আয়তন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, জানা যায় যে তাহা অসীম।

আমরা যাহাকে সচরাচর ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্তা বলি, তাহা কোন কাজের কথা নহে। আমাদের চক্ষু যদি অণুবীক্ষণের মত হইত তাহা হইলেই এখন যাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতেছি, তখন তাহাকেই অতিশয় বৃহৎ দেখিতাম। এই অণুবীক্ষণতা শক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর ততই বাড়িতে পারে। অত গোলে কাছকি, পরমাণুর বিভাজন ত আর কোথাও শেষ নাই; অতএব একটি বালুকাগার মধ্যে অনস্ত পরমাণু আছে, একটি পর্যন্তের মধ্যেও অনস্ত পর-
আলোচনা।

মায়ু আছে, ছোট বড় আর কোথায় রহিল। একটু পর্বতের পর্বতের প্রায় এক কুঠিতর অংশ তাই; কেহই ছোট নহে, কেহই বড় নহে, কেহই অংশ নহে সকলেই সমান। বালুকা কেবল যে জ্ঞেয়তার অসীম, দেশে অসীম তাহা নহে, তাহ। কালেও অসীম, তাহারই মধ্যে তাহার অনন্ত ভূত ভবিষ্যত বর্তমান একত্রে বিষয় করিতেছে।
তাহাকে বিস্তার করিলে দেশেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না, তাহাকে বিস্তার করিলে কালেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না। অতএব একটি বালুকা অসীম দেশ অসীম কাল অসীম শক্তি স্বতরাং অসীম জ্ঞেয়তার সংহত করিন্তা মাত্র।
চোখে ছোট দেখিতেছি বলিয়া একটা জ্ঞিনিষ সীমাবদ্ধ নাই হইতে পারে। হয়ত ছোট বড়ের উপর অসীমতা কিছু মাত্র নির্ভর করে না। হয়ত ছোটে যেমন অসীম হইতে পারে বড়ও তেমনি
অগাম হইতে পারে। হয়ত অগামকে ছোটই বল আর বড়ই বল সে কিছুই গায়ে পাতিয়া লয় না।

“যাহা কিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অগাম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে কে পারে তারে আয়ত করিতে!
বড় ছোট কিছু নাই, সকলি মহৎ।”

যাহা বলিলাম তাহা কিছুই বুঝি গেল না,
কেবল কতকগুলি। কথা হয় গেল মাত্র। কিন্তু
কোন কথাটাই বা সত্য! বালুকা সম্বন্ধে যে
কথাই বলা হইয়া থাকে তাহাতে বালুকাকে যথার্থ
স্বরূপ কিছুই বুঝি যায় না, একটা কথা মুখ্যস্থ
করিয়া রাখা যায়। ইহাতেও কিছু ভাল বুঝা
গেল না, কেবল একটা বুঝিবার প্রয়াস প্রকাশ
পাইল মাত্র।
বিজ্ঞ লোকেরা তিরস্কার করিয়া বলিবেন, যাহা বুঝা যায় না, তাহার জন্য এত প্রয়াসই বা কেন? কিন্তু তাহারা কোথাকার কে! তাহার দের কথা শোনে কে! তাহারা কেন দিন ঝর্ণাকে তিরস্কার করিতে যাইবেন, সে উপর হইতে নীচে পড়ে কেন? কেন দিন ধৌঁয়ার প্রতি আইনজীবি করিবেন সে যেন নীচে হইতে উপরে না ওঠে।

ডুবিবার কমতা।

যাহা হউক আর কিছু বুঝি না বুঝি এটা বোঝা যায় জগতের সবচেয়ে অত্যন্ত সমুদ্র। মহিষের মত পাঁকে গা ডুবাইয়া নাকচুকু জলের উপরে বাহির করিয়া জগতের তলা পাইয়াছি বলিয়া বে নিশ্চিত ভাবে জড়ের মত নিজ। দিব
তাহার যো নাই। এক এক জন লোক আর্জেন তাহাদের কিছুই যথেষ্ট মনে হয় না—খানিকটা গিয়াই সমস্ত শেষ হইয়া যায় ও বলিয়া উঠেন, এই বইত নয়। এই ক্ষুদ্রের মনে করেন, জগতের সকলেরই তাহাদের হাঁটাজল, ডুবজ্বল কোন খানেই নাই। জগতের সকলেরই উপরে ইহারা মাথা তুলিয়া আছেন—এ অভিমানী মাথাটা সব-স্থূল ডুবাইয়া দিতে পারেন, এমন স্থান পাইতেছেন না। অষ্টির হইয়া চারিদিকে অবশেষ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহারা যে জগতের অসম্পূর্ণতা ও নিজের মহত্ত্ব লইয়া গর্ব করিতেছেন। ইহাদের গর্ব ঘুচিয়া যায় যদি জানিতে পারেন ডুব দিবার ক্ষমতা ও অধিকার সকলের নাই। বিশেষ গৌরব থাকা চাই তবে মন হইতে পারিবে। সেলা যখন জলের চারিদিকে অস্পষ্ট ভাবে তালিয়া বেড়ায় তখন কি মনে
ডুবিবার স্থান।

যখন একটা কুকুর একটি গোলাপ ফুল দেখে,
তখন তাহার দেখা অতি শীতলই ফুরাইয়া যায়—
কারণ ফুলটি কিছু বড় নহে। কিন্তু এক জন
দাবুক যখন সেই ফুলটি দেখেন তখন তাহার
দেখা শীতল ফুরায় না, যদিও সে ফুলটি দেড়
ইঁকি অপেক্ষা আয়ত নহে। কারণ সে গোলাপ
ফুলের গতিরত। নিতান্ত সামান্য নহে। যদিও
তাহাতে ছুই কৌটার বেশী শিশির ধরে না,
তথাপি হৃদয়ের প্রেম তাহাকে যতই দাঁড় না কেন, তাহার ধারণ করিবার স্থান আছে। সে ক্ষুদ্রকায় বলিয়া যে তোমার হৃদয়কে তাহার বক্ষস্থিত কীটের মত গোটাকতক পাপড়ির মধ্যে কারারূপ করিয়া রাখে তাহা নহে। সে আরো তোমাকে এমন এক নূতন বিচরণের স্থানে লইয়া যায়, যেখানে এত বেশী সাধারণতা যে এক প্রকার অনির্দেশ্য অনির্বচনীয়তার মধ্যে হারা হইয়া যাইতে হয়। তখন এক প্রকার অক্ষুন্ন দৈব-বাণীর মত হৃদয়ের মধ্যে শুনিতে পাওয়া। যায়, যে মকরণেরই মধ্যে অসীম আছে; যাহাকেই তুমি তাল বাসিরে সেই তোমাকে তাহার অসীমের মধ্যে লইয়া যাইবে, সেই তোমাকে তাহার অসীম দান করিবে। কে না জানেন, যাহাকে যত তাল বাস। যায় সে ততই বেশী হইয়া উঠে—নহিলে প্রেমিক কেন বলিবেন, "জনম
অবধি হম রূপ নেহারবন্ধু নয়ন না তিরিপিত ভেল !
একটা মানুষ যত বড়ই হউক না কেন, তাহাকে দেখিতে কিছু বেশীক্ষণ লাগে না—কিন্তু আজম্ম কাল দেখিয়াও যখন দেখা ফুরায় না। তখন সে না—জানি কত বড় হইয়া উঠিয়াছে ! ইহার অর্থ আর কিছুই নেহ, অনুরাগের প্রভাবে প্রেমিক একজন মানুষের অন্তর্মিত অসীমের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, সেখানে, সে মানুষের আর অস্ত পাওয়া যায় না ; বদয় যতই দাও ততই সে গ্রহণ করে, যত দেখ ততই নতুন দেখা যায়, যত তোমার ক্ষমতা আছে ততই তুমি নিম্ন হইতে পার। এই জন্যই যথার্থ অনুরাগের মধ্যে একপ্রকার ব্যাকুলতা আছে। সে এত—খানি পায় যে তাহা প্রাণ ভরিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না—তাহার এত বেশী তৃপ্তি বর্জনমান, যে, সে-তৃপ্তিকে সে সর্বতোভাবে অধিকার করিতে
পারে না ও তাহাঁ স্মৃত্তিকৃত অর্থপ্রস্তরে ভিত্তিক পূর্ণ করিয়া বিরাঙ্গ করিতে থাকে। যেখানে অনুরাগ নাই সেই খানেই সীমাঃ সেই খানেই মহা অসীমের দ্বার রুদ্ধ, সেইখানেই চারিদিকে লোহের ভিত্তি, কারাগার! অগত্য যে তাল বাসিতে শিখে নাই, সে বাণ্ডী অষ্টকুপের মধ্যে অট্টা পড়িয়াছে। সে মনে করিতেও পারে না। এই টুকুর বাহিরের কিছু থাকিতে পারে। তাহার নিজের পায়ের শিক্ষিতার বৃহৎ বৃহৎ শব্দই তাহার জগতের একমাত্র সঙ্গীত। সে কল্পনাও করিতে পারে না। কোথাও পাথী থাকে, কোথাও সূর্যের কিরণ বিকীর্ণতা হয়।

অনুরাগেই যে যথার্থ স্বাধীনতা তাহার একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণ নতুন লোকের মধ্যে গিয়া পড়িলে আমরা থেন নিঃসার লইতে পারি না, হাত পা ছড়াইতে সম্ভোচ হয়,
যে কেহ লোক থাকে সকলেই যেন বাধার মত বিরাজ করিতে থাকে, তাহারা সদয় ব্যবহার করিলেও সকল সময়ে মনের সন্ধুচ দূর হয় না। তাহার কারণ, এক মাত্র অনুরাগের অভাব বশতঃ আমরা তাহাদের হঠাৎরূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাই না, যেখানে স্বাধীনতার মথার্থ বিচরণ-ভূমি সে স্থান আমাদের নিকট রূপে। আমরা কেবল তাহাদের নাকে চোখে মুখে, আচারে ব্যবহারে, নূতন ধরণের কথায় বাঁচায় হঁটু ঠোকর ধাক্কা খাইতে থাকি।

পুরাতনের নূতনত্ব।

অতএব দেখা যাইতেছে জগতের সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে অনন্ত অদৃশ্য বর্তমান। নিত্যনূতন নামক যে শক্তি কবিরা ব্যবহার করিয়া থাকেন।
সেটাকি নিতান্ত একটা কথার কথা, একটা আল-স্কারিক উজ্জ্ব মাত্র! তাহার মধ্যে গভীর সত্য আছে। অন্যম যতই পুরাতন হউক না কেন তাহার নূতনত্ব কিছুতেই যুথচে না। সে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই বেশী নূতন হইতে থাকে, সে দেখিতে যতই শুদ্ধ হউক না কেন, প্রত্যেক তাহাকে অতিশ অধিক করিয়া পাইতে থাকি। এই নিমিত্ত যথার্থ যে প্রেমিক সে তার নূতনের জন্য সক্রিয় লালায়িত নহে, শুদ্ধ তাহাই নয়, পুরাতন ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না। কারণ নূতন অতি শুদ্ধ, পুরাতন অতি রহৎ। পুরাতন যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই তাহার অন্যম বিষ্টার প্রেমিকের নিকট অবারিত হইতে থাকে, হৃদয় ততই তাহার মনস্থানের অভিমুখে ক্রমাগত ধার্মিক হইতে থাকে, ততই জানিতে পারে যায় হৃদয়ের বিচরণক্ষেত্র অতি
রহস্য, হ্রদয়ের স্বাধীনতার কোথাও বাধা নাই।
যে বাক্তি, একবার এই পুরাতনের গভীরতার
মধ্যে মথ হইতে পারিয়াছে, এই সাগরের হ্রদয়ে
সম্প্রসারণ করিতে পারিয়াছে সে কি আর ছোট
ছোট বাংলার আনন্দ-কল্লোল শুনিয়া প্রত্যাহিত
হইয়া নূতন নামক সকীর্ণ কুপটার মধ্যে আপ-
নাকে বদ্ধ করিতে পারে।

সাম্য।

এ জগতে সকলি যে সমান, কেহ যে ছোট-বড় নহে, তাহ। প্রেমের চক্ষে ধরা পড়িল। এই
নিমিত্ত যখন দেখা যায়, যে, একজন লোক কুৎসিৎ মুখের দিকে অঘটিত নয়নে চাহিয়া আছে,
তখন আর আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই—
আর একজনকে দেখিতে ছি সে সুন্দরমুখের দিকে
ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিরা আছে, ইহাতেও অশ্চর্য হইবার কোন কথা নাই। অনুরাগের প্রভাবে উভয়ে মানুষের এমন স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখানে সকল মানুষই সমান, যেখানে কাহারও সহিত কাহারো। একচূল ছোটবড় নাই, যেখানে সুন্দর কুৎসিৎ প্রভৃতি তুলনা আর খাটেই না। সীমা এবং তুলনীয়তা কেবল উপরে, একবার যদি ইহ। ভেদ করিয়া। ভিতরে প্রবেশ করিতে পার ত দেখিবে সেখানে সমস্তই একাকার, সমস্তই অনন্ত। এতবড় প্রাণ কাহার আছে সেখানে ও বেশ করিতে পারে, বিশ্বচরাচরের মহাসুম্বুদ্ধে অসীম ভূব ভূবিতে পারে। প্রেমে সেই সুমদ্রে সত্ত্বরণ করিতে শিখায়—যাহাকেই ভালবাস না কেন তাহাতেই সেই মহা স্বাধীনতার নূতনাধিক আশ্রয় পাওয়া যায়! এই যে শুন্য অনন্ত আকাশ
ইহাও আমাদের কাছে সীমাবদ্ধরূপে একাশ পায়, মনে হয় যেন একটি অচল কঠিন সূর্যগোল নীল মণ্ডপ আমাদিগকে বেরিয়া আছে ; যেন খানিক-দূর উঠিলেই আকাশের ছাতে আমাদের মাথা ঠেকিবে। কিন্তু ডান। থাকিলে দেখিতাম ঐ নীলিমা আমাদিগকে বাধা দেয় না, ঐ সীমা আমাদের চোখেরই সীমা ; যদিও মণ্ডপের উর্দ্ধে আরও মণ্ডপ দেখিতাম, তদূরের উঠিলে আবার আর-একটা মণ্ডপ দেখিতাম, তথাপি জ্ঞানিতে পারিতাম যে, উহারা হামাদিগকে মিথ্যা তর দেখাইতেছে, উহারা কেবল ফাঁকি মাত্র। আমাদের স্বাধীনতার বাধা আমাদের চক্ষু, কিন্তু বাস্তবিক বাধা কোথাও নাই !
অমার একজন বন্ধু দার্জিলিং কাশ্মীর প্রভূতি নানা রমণীয় দেশ ভ্রমণ করিয়া। ইনি একি বিলিলেন বাংলার মত কিছুই লাগিল না। কথাটা শুনিয়া অধিকাংশ লোকই হাসিয়ে ভিক্ত হাসিবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। বরং যাহারা বলেন বাঙ্গালায় দেখিবার কিছুই নাই, সম্পূর্ণায় প্রায় সমস্ত স্থান, পাহাড় পর্যন্ত প্রভূতি বৈচিত্র্য কিছুই নাই, দেশটা দেখিতে ভালই নহে, তাহাদের কথা লুন্ঠনেই বাস্তবিক আশ্চর্য বোধ হয়। বাঙ্গালা দেশ দেখিতে ভাল নয়। এমন মায়ের মত দেশ আছে। এত কোন-ত্রু শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, এমন মেহেহারাশালিনী ভাগীরথীপ্রাপ্তা কোমল হদয়া, তরলতাদের প্রতি এমনতর অনির্বচনীয়
কল্যাণময়ী মাতৃভূমি কোথায়। একজন বিদেশী আসিয়া যাহা বলে শোভা পায়, কিন্তু আজম্ম-কাল ইহাঁর কোলে যে মানুষ হইয়াছে সেও ইহাঁর সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না। সে ব্যক্তি যে প্রেমিক নহে ইহা নিশ্চয়ই। স্মৃতরাং বাঙ্গলা দেশে সে বাস করে মাত্র, কিন্তু বাংলা দেশ সে দেখেই নি—বাঙ্গলা দেশে সে কখনো যায় নি, ম্যাপে দেখিয়াছে মাত্র। এত দেশে গিয়াছি এত নদী দেখিয়াছি কিন্তু বাংলার গঙ্গা যেমন এমন নদী আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু কেন? অমূক দেশে একটা নদী আছে সেটা গঙ্গার চেয়ে চওড়া—অমূক সাগরে একটা নদী পড়িয়াছে সেটা গঙ্গার চেয়ে দীর্ঘ—অমূক স্থানে একটা নদী বহিতেছে, গঙ্গার চেয়ে তাহার তরঙ্গ বেশী। ইত্যাদি।
কেন।

এই কেন লইয়াইত যত মারামারী। যে ভালবাসে সে কেনর উত্তর দিতে পারে না। তুমি তক্র করিলে বাঙ্গলার চেয়ে কাশ্মীর ভাল দেশ হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু তবু আমার কাছে কেন বাঙ্গালী ভাল দেশ। তারকিক বলেন, বাল্য-বধি বাঙ্গল। দেশটা তোমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাই ভাল লাগিতেছে। ঠিক কথা। কিন্তু অভ্যাস হইয়া যাওয়ার দরুণ ভাল লাগিবার কি কারণ হইতে পারে। তাহাদের কথার ভাবটা এই যে বাঙ্গলা দেশে আসলে যাহা নাই, আমি তাহাই যেন নিজের তহবিল হইতে দেশকে অর্পণ করি। এ কথা কোন কাজের নহে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রেম একটি সাধনা। ভাল বাসিয়া আজ্ঞম প্রত্যহ দেশের পানে চাহিয়া।
দেখিলে দেশ সদয় হইয়া। তাহার প্রাণের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যান—কারণ সকলেরই প্রাণ আছে। ভাল বাসিলে সকলেই তাহার প্রাণে তাকিয়া লয়। বাহা আকার-আয়তনের মধ্যে স্বাধীনতা নাই, তাহা। বাধাবিপত্তিসয়—আকার আয়তনের অতীত প্রাণের মধ্যেই স্বাধীনতা—সেখানে পায়ে কিছু ঠেকেনা, চোখে কিছু পড়ে না, শরীরে কিছুই বাধে না—কেবল এক পুকার অনির্বচনীয় স্বাধীনতার আনন্দ। ইহার কাচে কি আর “কেন” বেঁচিতে পারে! দেশের আমাদের হৃদয়ের কি স্বাধীনতা। দেশের আমাদের কতখানি জায়গা। কারণ দেশের শরীর শুভ্র দেশের হৃদয় রহৎ। দেশের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি। দেশের ও তেজে গাছিপাল। আমাদের চোখে ঠেকে না আমরা একবারই তাহার বিতরকার ভাব তাহার হৃদরস্পূর্ণ মাধুরী দেখিতে
পাই। এই সৌন্দর্য এই স্বাধীনতা সকল দেশের লোকেই সমান উপভোগ করিতে পারেন।

ইহার জন্য ভূগোল বিবরণ পড়িয়া। রেলোয়ের টিকিট কিনিয়া দুরদুরান্তের যাইবার প্রয়োজন

নাই।

এক কাঠা জমি।

একদল লোক আছেন তাহারা যেখানে যতই পুরাতন হইতে থাকেন সেই খানে ততই অনুরাগসূত্রে বদন হইতে থাকেন। আর একদল লোক আছেন, তাহাদিগকে অভ্যাস-সূত্রে কিছু তেই বাধিতে পারে না, দশ বৎসর যেখানে আছেন সেও তাহার পক্ষে যেমন, আর একদিন যেখানে আছেন সেও তাহার পক্ষে তেমনি।

লোকে হয়ত বলিবে তিনিই যথার্থ দুরদুরান্তে,
এক কাঠা জমি।

অগন্ধুপাতী, কেবল মাত্র সামান্য অভ্যাসের দরুণ তাহার নিকট কোন জিনিষের একটা মিথ্যা বিশেষত্ব প্রতীতি হয় না। বিশ্বজনীনতা তাহাতেই সম্ভবে। ঠিক উঠে কথা। বিশ্বজনীনতা তাহাতেই সম্ভবে না। বিশ্বের প্রত্যেক বিশ্ব প্রত্যেক কাঠাতেই বিশ্ব বর্তমান। একদিনে তাহা আয়ত্ত হয় না। প্রত্যহ অধিকার বাড়িতে থাকে। যিনি দশবৎসরে এক স্থানের কিছুই অধিকার করিতে পারিলেন না তিনি বিশ্বকে অধিকার করিবেন কি করিয়া। বিশ্ব সর্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম প্রশস্ত। অতএব বিশ্বের এক কাঠ। জমিকে যথার্থ ভালবাসিতে গেলে বিশ-জনীনতা থাক। চাই।
জগৎ মিথ্যা।

ধাঁহারা বলেন জগৎ মিথ্যা, তাহাদের কথা এক হিসাবে সত্য এক হিসাবে সত্য নয়। বাহির হইতে জগৎকে যেরূপ দেখা যায় তাহা মিথ্যা। তাহার উপরে ঠিক বিশ্বাস স্থাপন কর। যায় না।

ঈর্থ কাপিতেছে, আমি দেখিতেছি আলো; বাতাসে তরঙ্গ উঠিতেছে আমি শুনিতেছি শব্দ; ব্যবচ্ছেদবিশিষ্ট অতি সুক্ষ্মতম পরমাণুর মধ্যে অস্করণ বিক্রম চলিতেছে আমি দেখিতেছি বহুদৃশ্ব ব্যবচ্ছেদহীন বস্তু। বস্ত্রবিশেষ কেনই যে বস্ত্রবিশেষ রূপে প্রতিভাত হয় আর-কিছু রূপে হয় না, তাহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। আশ্চর্য কিছুই নাই, আমাদের নিকটে যাহা বস্ত্ররূপে প্রতিভাত হইতেছে, আর একদল নূতন জীবের নিকটে তাহা। কেবল
শক্রুপে প্রাতীত হইতেছে। আমাদের কাছে বস্তু দেখা ও তাহাদের কাছে শন্দ শোনা একই। এমন অশ্চর্য্য নহে, আর এক নূতন জীব দৃষ্টি শ্রুতি ছাণ ম্যাদ স্পর্শ ব্যতীত আর এক নূতন ইন্দ্রিয়-শক্তি দ্বারা বস্তুকে অমূল্য করে তাহা আমাদের কল্পনার অতিল। বস্তুকে ক্রমাগত বিশ্লেষ করিতে গেলে তাহাকে ক্রমাগত সুক্ষ্ম হইতে সুক্ষ্ম পরিণত কর। যাও-অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের ভাষায় যাহার নাম নাই, আমাদের মনে যাহার ভাব নাই। মুখে বলি তাহা অসংখ্য শক্তির খেলা, কিন্তু শক্তি বলিতে আমরা কিছুই বুঝি। অতএব আমরা যাহা দেখিতেছি গুলিতেছি, তাহার উপরে অন্ত বিখ্যাত স্থাপন করিতে পারি না। কাজের স্ববিধার জন্য রক্ষা করিয়া কিছু দিনের মত তাহাকে এই আকারে বিখ্যাত করিবার একটা বন্দোবস্ত
হইয়াছে মাত্র; আবার অবস্থা পরিবর্তনে এ চুক্তি ভাঙিয়ে তাহার জন্য আমরা কিছুমাত্র দায়িক হইব না।

তুলনায় অকটি।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে, এই বেলা। সেই কথাটা বলিয়া লই, পুনঃপুনঃ পূর্বকথা উত্থাপন করা যাইবে। অনেক লোক আছেন তাহারা কথা বাঁচাতেই কি, আর কবিতাতেই কি, তুলনা বদাস্ত করিতে পারেন না। তুলনাকে তাহারা নিতাস্ত একটা ঘরগড়। মিথ্যারূপে দেখেন; নিতাস্ত অনুগ্রহ-পূর্বক ওটাকে তাহারা মানিয়া লন মাত্র। তাহারা বলেন যেটা যাহা। সেটাকে অংশীই বল, সেটাকে আবার আর-একটা বলিলে তাহাকে একটা অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু
তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।
ইহার কঠিন নৈয়ায়িক লোক, ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে সকল কথা বাজাইয়া লন, কবিতার তুলনা উপরা প্রার্থী নয় শাসনের নিকট যাচাই করিয়া তবে গ্রহণ করেন। অতএব ইহাদের কাছে শাসন অনুসারেই কথা কহা যাক। জগৎসংসারে কোনো জিনিষট একবারে সত্যম, কোনো জিনিষট এতবড় প্রতাপার্থিত যে কোন-কিছুর সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না। জড়বৃদ্ধির সকল জিনিষকেই পুথক করিয়া দেখে, তাহাদের কাছে সবই সম-প্রধান। বুদ্ধির যতই উন্নতি হয় ততই সে এক্কো দেখিতে পায়। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ক্রমাগত একের প্রতি ধার্মিক হইতেছে। সহজ-চক্ষে যাহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল, তাহাও অভেদাত্মা হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ বিখ্যাত্তে বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ঐক্য, দর্শন দার্শনিক ঐক্য।
দেখাইতেছে, কবিতা কি অপরাধ করিল? তাহার কাজ জগতের সৌন্দর্য্যাগত ভাবগত ঐক্য বাহির করা। তুলনার সাহায্যে কবিতা তাহাই করে; তাহাকে যদি তুমি সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য না কর, কল্পনার ছেলেখেলা মাত্র মনে কর তাহা হইলে কবিতাকে অন্যায় অগমন করা হয়। কবিতা যখন বলে, তারাগুলি আকাশে চলিতে চলিতে গান গাহিতেছে—যথা।

There's not the smallest orb which thou beholdest
But in his motion like an angel sings.

তখন তুমি অনুগ্রহ পূর্বক শুনিয়া গিয়া কবিকে নিহাতই বাধিত কর। মনে মনে বলিতে থাক, তারা চলিতেছে ইহা স্থীরকাণ্ড করি, কিন্তু কোথায় চলা আর কোথায় গান গাওয়া! চলাটা চোখে দেখিবার বিষয় আর গান গাওয়াটা কানে শুনিবার—তবে অলঙ্কারের হিসাবে মন্দ
হয় নাই। কিন্তু হে তলকর্ণাচ্ছলিত, বিজ্ঞান
যথাস্থলবলে, বাতাসের তরঙ্গ লীলামুক্তি ধরিন, তখন
তুমি কেন বিনা বাক্যাবল্লে অল্পান বদনে কথাবাটি
টাকে স্বাধ্যায়তার করিয়া ফেল। কোথায় বাতাসের
বিশেষ একচর কৃপণ নামক গতি, তার
কোথায় আমাদের শক্তি শুনিতে পাওয়া যায়।
সচরাচর বাতাসের গতি আমাদের স্পর্শের বিষয়
কিন্তু শক্তি ও স্পর্শে যে ভাই-ভাই সম্পর্ক ইহাকে জানিত! বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা করিয়া
জানিয়াছেন, কবির হস্তের ভিতর হইতে
জানিতেন। কবির জানিতেন, হস্তের মধ্যে
এমন একটা জায়গা আছে যেখানে শক্তিগতির
ব্যাপার সমস্ত একাকার হইয়া যায়। তাহারা
যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষণ হতন্তশ। তাহারা
মান দিক হইতে মান চর্চা হতন্তশ তারে উপার্জন
করিয়া আছে, কিন্তু হস্তের অত্ত্বপুরের
মধ্যে সমস্তই একত্রে জমা করিয়া রাখে,“এবং এমনি গলাগলি করিয়া থাকে যে কোন যে কে চেনা যায় না। সেখানে গলকে স্পৃশা বলিতে আপত্তি নাই, রূপকে গান বলিতে বাধে না। পূর্বেই ত বলা হইয়াছে, যেখানে গভীর সেখানে সমস্তই একাকার। সেখানে হাসিও মা কায়াও তাও, সেখানে সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।

জানে যাহারা বর্ষর তাহারা যেমন জগতে বৈজ্ঞানিক ঐক্য দার্শনিক ঐক্য দেখিতেও পায় না বুঝিতেও পারে না, তেমনি তারে যাহারা বর্ষর তাহারা কবিতাগত ঐক্য দেখিতেও পায় না বুঝিতেও পারে না। ইংরেজি সাহিত্য পড়িয়া আমার মনে হয় কবিতায় ভুলন। কেমনই উন্নতি লাভ করিতেছে, যাহাদের মধ্যে ঐক্য সহজে দেখা যায় না, তাহাদের ঐক্যও বাহির
হইয়া পড়িতেছে। কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে ও আর কখন বিচ্ছেদ হইবে না।

জগৎ সত্য।

যাহা হউক দেখা যাইতেছে, সবই একাকার হইয়া পড়ে, জগতে না থাকিবার মতই হইয়া আসে। যাহা দেখিতেছি তাহ যে তাহাই নহে ইহাই কেমন মনে হয়। এই জনাই জগৎকে কেহ কেহ মিথ্যা বলেন। কিন্তু আর এক রকম করিয়া জগৎকে হয়ত সত্য বলা যাইতে পারে।

সত্য যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহার কখন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে তাহা একটা ভাব জাত। কিন্তু ভাব আমাদের নিকট নানারূপে প্রকাশ পায়, ভাষা
আকারে, আকার আকারে, বিভিন্ন বস্তুর বিচিত্র বিনাস আকারে। তেমনি প্রকৃত জগৎ যাহা তাহা অদৃশ্যা, তাহা কেবল একটি ভাব মাত্র, সেই ভাবটি আমাদের চোখে বহির্জগতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। যেমন, যাহা পদার্থ নহে যাহা একটি শক্তি মাত্র তাহাকেই আমরা বিচিত্র বর্ণরূপে আলোকরূপে দেখিতেছি ও উত্তাপ রূপে অন্যভাব করিতেছি, তেমনি যাহা একটি সত্যমাত্র তাহাকে আমরা বহির্জগত রূপে দেখিতেছি। একজন দেবতার কাছে হযত এ জগৎ একবারই অদৃশ্য, তাহার কাছে আকার নাই আয়তন নাই, গন্ধ নাই, রূপ নাই স্পর্শ নাই, তাহার কাছে কেবল একটি জান। আছে মাত্র। একটা তুলনা দিই। তুলনাটা ঠিক না হউক একটুখনি ক'ছাকাছি আসে। আমার যখন বর্ণপরিচয় হয় নাই, তখন যদি আমার
নিকটে একখানা বই। আমি দেওয়া হয়—তবে সে বইয়ের প্রত্যেক অংশ আমার চক্ষে পড়ে, প্রত্যেক বর্ণ আলাদা আলাদা করিয়া দেখিতে পাই ও সমস্ত অনর্থক ছেলেখেলা মনে করি। কিন্তু যখন পড়িতে শিখি, তখন আর অক্ষর দেখিতে পাই না। তখন বস্ত্রতঃ বঠলা আমার নিকটে অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু তখনি বঠল। যথার্থতঃ আমার নিকটে বিরাজ করিতে থাকে। তখন আমি যাহা দেখি তাহা দেখিতে পাই না, আর একটা দেখিতে পাই। তখন আমি বস্ত্রতঃ দেখিলাম, গে-যে আকার ছ, (গাছ) কিন্তু তাহা না দেখিয়া। দেখিলাম একটা ডালপালা-বিশিষ্ট উদ্দেশ্য পদার্থ। কোথায় একটা কালো। আঁচড় আর কোথায় একটা রঙ্গ রঙ্গ। কিন্তু যতক্ষণ পরস্পর না আমরা বুঝি। পড়িতে পারি ততক্ষণ-পর্যন্ত ঐ আঁচড়গুলো। কি সমস্তই মিথ্যা নহে!
ফে বাক্তি শাদা কাগজের উপরে হিজিবিজি কাঠে তাহাকে কি আমরা নিতান্ত অকর্মণ্য বলিব না! কারণ অকর্ম মিথ্যা। আমার একরূপ অকর্ম আর-একজনের আর-একরূপ অকর্ম। ভাষা মিথ্যা। আমার ভাষা এক তোমার ভাষা আর-এক। আজিকার ভাষা এক কালিকার ভাষা আর-এক। এ ভাষায় বলিলেও হয় ও-ভাষায় বলিলেও হয়। গাছ বলিয়া একটি আওয়াজ শুনিলে আমি মনের মধ্যে যে জিনিষটা দেখিতে পাইব, আর-একজন বাক্তি টীকা বলিয়া একটি আওয়াজ না শুনিলে ঠিক সে জিনিষটা মনে আনিতে পারিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে অকর্ম ও ভাষা তুমি ঘরে গড়িয়া বন্দোবস্ত করিয়া বদল করিতে পার, কিন্তু তাহারি আশ্রিত ভাব-টিকে খেয়াল অনুসারে বদল করা যায় না। তাহা থ্রু।
প্রেমের শিক্ষা।

জগৎকে যে আমাদের মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার কারণ কি এমন হইতে পারে না যে, জগতের বর্ণপরিচয় আমাদের কিছুই হয় নাই! জগতের প্রাতোক অক্ষর আঁচড়ের আকারে স্তুতরাং মিথ্যা আকারে আমাদের চোখে পড়িতেছে। যখন আমরা বাস্তবিক জগৎকে পড়িতে পারিব তখন এ জগৎকে দেখিতে পাইব না। এ পড়া কি এক দিনে শেষ হইবে! এ বর্ণগালা কি সামান্য না?

এ জগৎ মিথ্যা নয় বুঝি সত্য হবে,
অক্ষর আকারে শুধু লিখিত রয়েছে।
অসীম হতেছে বাস্তু সীমা রূপ ধরি!

প্রেমের শিক্ষা।

কিন্তু কে পড়াইবে! কে বুঝাইয়া দিবে যে জগৎ কেবল স্তূপাকৃতি কতকগুলো। বন্ধ নহে,
উহার মধ্যে ভাব বিরাজমান ? আর কেহ নহে প্রেম। জগৎকে যে যথার্থ ভালোবাসে সে কখন মনে করিতেও পারে না, জগৎ একটা নিষ্ঠুর জড়পিও। সে ইহারই মধ্যে অসীমের ও চির-জীবনের আভাস দেখিতে পায়। পুরুষের বলা হইয়াছে প্রেমেই যথার্থ স্বাধীনতা। কারণ যতটা দেখা যায় প্রেমে তার চেয়ে চের বেশী দেখাইয়া দেয়।

জগৎকে কখনই মিথ্যা মনে করিতে পারি না, যখন জগৎকে ভালবাসি! একজন যে-সে লোক মরিয়া গেলে আমরা সহজেই মনে করিতে পারি যে, এ লোকটা একবারে ধ্বংশ হইয়া গেল, কারণ সে আমার নিকট এত সুদৃঢ়। কিন্তু একজন শ্রীযু ব্যক্তিকের মরণে আমাদের মনে হয় এ কখনো মরিতে পারে না। কারণ তাহার মধ্যে আমরা অসীমতা দেখিতে পাইয়াছি। যাহাকে এত
বেশি তাল বাসিয়াছি সে কি একবারে "নাই" হইয়া যাইতে পারে! সে ত কম লোক নয়। তাহার যতখানি হৃদয় দিয়াছি ততখানি নিহ। সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উপরে যতই আশা স্থাপন করিয়াছি ততই আশা। ফুরায় নি, রজ্জুবদ্ধ লোচ্ছ-খওয়ার মত আমার সমস্ত। তাহার মধ্যে ফেলিয়া মাপিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার তল পাই নাই। যাহার নিকট হইতে সীমা যতদূরে তাহার নিকট হইতে মুহূর্ত ও তত দূরে। অতএব এতখানি বিশালতার এক মুহূর্তের মধ্যে সকর্তোভাবে অঙ্কন এ কথা সম্ভবপর নহে। প্রেম আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে এই কথা বলিতেছে, তবে যাহা বলতেন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রেম আসিয়াই আমাদের শিক্ষা। দেয় এ জগৎ সত্য এবং প্রেমই বলে সত্য উপরে ভাসিতেছে না, সত্য ইহার অভাবের নিহিত আছে। যাহা হউক পথ
দেখিতে পাইলাম, আশা জমিতেছে কোন তাহাকে পাইতেও পারি। ঈহাকে অবিশ্বাস করিয়া মরণকে বিশ্বাস করিলে কি সুখ! হৃদয়ের সজ্জাতার যতই উন্নতি হইবে এই মরণের প্রতি বিশ্বাস ততই চলিয়া যাইবে জীবনের প্রতি বিশ্বাস ততই বাড়িয়ে।

ভাল করে পড়িব এ জগতের লেখা।

গুরু এ অক্ষর দেখে করিব না যুগ।
লোক হতে লোকান্তরে ভোলিয়া ভোলিয়া, একে একে জগতের পৃষ্ঠু উলটিয়াই, ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার।
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে।
অ্যাই মেলি চারিদিকে করিব ভগ্নন,
ভাল বেদে চাহিব এ জগতের পানে,
তবেত দেখিতে পাব যথার্থ ঈহার।
ধর্ম।

প্রেমের যোগ্যতা।

একবারেই প্রেমের যোগা নহে এমন জীব কোথায়। যত বড় পাপী অসাধু কুশীলে সে হইক না কেন, তাহার মা ত তাহাকে ভালবাসে। অত-এব দেখিতেছি, তাহাকেও ভালবাসা যায়, তবে আমি ভালবাসিতে না পারি সে আমার অসপূর্ণতা।

পথ।

যেমন, জড়িষ্ঠ বল আর প্রাণীর বল সকলেরই মধ্যে এক মহা চৈতন্যের নিয়ম কার্য্য করিতেছে, যাহাতে করিয়া উত্তরের প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি পাপীই বল আর সাধুই
বল সকলেরই মধ্যে অসীম পুণ্যের এক আদর্শ বর্তমান থাকিয়া কার্য করিতেছে। সূর্যের পাঠের সকলেরই কাছে রহিয়াছে, কেহই তাহা হইতে বক্তি নাহে। তবে কেহ বা সোজা রাজপথে চলিয়াছে, কেহ বা নির্ন্দিতাবশতঃই হউক, কৌতূহলবশতঃই হউক, একবার মোড় ফিরিয়া গলির মধ্যে গৃবেশ করিয়াছে, অবশেষে বহুক্ষণ ধরিয়া। এ-গলি ও-গলি সে-গলি করিয়া পুনর্বেল সেই রাজপথে বাহির হইয়া পড়িতেছে, মাঝের হইতে পথ ও পথের কঠোর বিচ্ছেদ যাইতেছে। কিন্তু জগতের সমুদয় পথই একই দিকে চলিয়াছে, তবে কোনটার বা ঘোর বেশী, কোনটার বা ঘোর কম এই যা তফাত।

পাপ পুণ্য।

অতএব, পাপ বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তাহা নাহে। পাপীর যে ধার্মিকের
চেতনা।

চেয়ে বেশী কিছু আছে তাহা নহে, ধার্মিক যতটা আছে পাপীর ততটা নাই এই পর্যায়। পাপীর ধর্মশুদ্ধি অচেতন অপরিণত। পাপ অভাব, পাপ মিথ্যা, পাপ মূল্য। অতএব আর সকলই থাকিবে কেবল পাপ থাকিবে না,—যেমন অন্যকার-ঈশ্বর কম্পন-দ্রাঘাবে উত্তরোত্তর আলোক হইয়া উঠে, তেমনি পাপ চেতনের প্রভাবে উত্তরোত্তর পুণ্য পরিণত হইতে থাকিবে।

চেতনা।

যাহা ধ্রুব তাহাই ধর্ম। এই ধ্রুবের আশ্রয়ে আছে বলিয়াই জগতের মূৰ্ত্তিভর নাই। একটি ধ্রুবসত্ত্ব এই সমস্ত বিশ্বের মালার মতন গাঁথা রহিয়াছে। খুল্লতম হইতে বৃহত্তম কিছুই সেই সূত্র হইতে বিচিত্র নহে, অতএব
সকলই ধর্মের বাঁধনে বাঁধা। তবে সেই বন্ধন-
সম্প্রে কেহ বা সচেতন কেহ বা অচেতন।
অচেতনের বন্ধনই দাসত্ব, আর সচেতনের বন্ধনই
প্রেম।

অচেতন।

আমরা বসতখানি অচেতন, ততখানি সচেতন
নহি ইহা নিশ্চয়ই। আমাদের শরীরের মধ্যে
কোথায় কোন যন্ত্র কিরূপে কাজ করিতেছে,
তাহার কিছুই আমরা জানি না। একটুখানি
যেখানে জানি, সেখানে অনেকখানিই জানি না।
শরীরের সম্বন্ধে যাহা খাটে, মনের সম্বন্ধেও ঠিক
তাহাই খাটে। আমাদের মনে যে কিছু আছে,
তাহা অতি যৎসামান্য পরিমাণে আমরা জানি
মাত্র, যাহা জানি না তাহাই অগাছ। কিন্তু
যাহা জানিনা তাহাও যে আছে, ইহা অনেকেই
বিশাল করিতে চাহেন না। তাহারা বলেন, মনের কার্যা জানা, মনে আছে অথচ জানিতেছি না, এ কথাটাই স্বতোবিন্দু কথা—এমন হলে না-হয় বলাই গেল যে তাহা নাই।

বিজ্ঞান-এরূপ নিম্নলিখিত ঘটনা অনেকেই পড়িয়া থাকিয়েন। একজন মূর্খ দাসী বিকারের অবস্থায় অনর্গল লাটিন আওড়াইতে লাগিল। সহজ-অবস্থায় লাটিনের বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। ক্রমে অমুঠক্ষান করিয়া জানা গেল, পূর্বে সে একজন লাটিন পণ্ডিতের নিকট দাসী ছিল। যদিও লাটিন শিখে নাই ও জাগ্রত অবস্থায় তাহার লাটিনের স্মৃতি সম্পূর্ণ নিঃস্থিত থাকে, তথাপি উত্তর পণ্ডিতকর্তৃক উচ্চারিত লাটিন পদগুলি তাহার মনের মধ্যে সমস্তই বাস করিতেছিল। সকলেই জানিয়ে বিজ্ঞান-এরূপ এরূপ উদাহরণ বিন্দুর আছে।
বিশ্বুতি।

আমাদের স্মরণশক্তি অতি ক্ষুদ্র, বিশ্বুতি অতিশয় বহুৎ। কিন্তু বিশ্বুতি অর্থে ত বিনাশ বুঝায় না। স্মৃতি বিশ্বুতি একই জাতি। একই স্থানে বাস করে। বিশ্বুতির বিকাশকেই বলে স্মৃতি, কিন্তু স্মৃতির অভাবকেই যে বিশ্বুতি বলে তাহা নহে। এই অতি বিপুল বিশ্বুতি আমাদের মনের মধ্যে বাস করিতেছে। বাস করিতেছে মানে কি নিদ্রিত আছে, তাহা নহে। অবিশ্বাস কাজ করিতেছে, এবং কোন কোনটা স্মৃতিরূপে পরিপূর্ণ হইয়া উথিতেছে। আমাদের রক্ত চলাচল অনুভব করিতেছি না বলিয়া যে রক্ত চলিতেছে না, তাহা বলিতে পারি না। পুরুষানুক্রমবাহী কতশত গুণ আমাদের মধ্যে অজ্ঞাতসারে বাস করিতেছে। তা-
হার জুনেকগুলিই হয়ত আমাতে বিকিত হইল না, আমার উত্তর পুরুষে বিকিত হইয়া উঠিয়া। এই গুলি, এই অতি নিকটের সামগ্রী গুলিই যদি আমরা না। জানিতে পারিলাম, তবে সমস্ত জগতের আত্মা যে আমার মধ্যে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহা আমি জানি নি কি করিয়া! জগতের হৃদয়ের মধ্য দিয়া আমার হৃদয়ে যে একই সূত্র চলিয়া গিয়াছে তাহা অনুভব করিব কি করিয়া! কিন্তু সে অবিশ্বাস তাহার কার্যা করিতেছে। আমি কি জানি, বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পরমাণু অহরিন্ধি আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, এবং আমিও বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পরমাণুকে অবিশ্বাস আকর্ষণ করিতেছি? কিন্তু জানিনা বলিয়া কোন কাজটা বন্ধ রহিয়াছে!
জগতের বন্ধন।

বিশ্ব-জগতের মধ্যদিয়া আমাদের মধ্যে যে দৃঢ়সূত্র প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে ইহাই ছিম করিয়া ফেল। মুক্তি, এইরূপ কথা শুনা যায়। কিন্তু ছিম করে কাহার সাধা! আমি আর জগৎ কি সতন্ন?' কেবল একটা ঘরগড়া বাঁধনে বাধা? সেইটে ছিঞ্চিয়া। ফেলিলেই আমি বাহির হইয়া যাইব? আমি কথা জগৎ-ছাড়। নই, জগৎ আমাকে ছাড়া নয়। আমাকে সকলকেই জগৎকে গণনা করিবার সময়, আমাকে ছাড়া আর সকলকেই জগতের মধ্যে গণনা করি, কিন্তু জগৎ সে গণনা মানে না।

জগৎ দিনরাত্রি অনন্তের দিকে ধারিয়া হইতেছে কিন্তু তথাপি অনন্ত হইলে অনন্ত দূরে। তাহাই দেখিয়া অধীর হইয়া আমি যদি
ধনে করি, জগতের হাত এড়াইতে পারিলেই আমি অনস্ত লাভ করিব, তাহা হয় ত ভ্রম হইতে পারে। অনস্তের উপরে লাফ দেওয়া ত চলে না। আমাদের সমস্ত লম্ফরঞ্জ এই খানেই। এই জগতের উপরেই লাফাইতেছি এই জগতের উপরেই পড়িতেছি। আর, এই জগতের হাত হইতে অব্যাহতিতে বা পাই কি করিয়া? ক'ভে আঙ্গুলট। হঠাত, যদি একদিন এমনতর শ্রীর করে যে, অনুসন্ধ শরীরের প্রাণে বাস করিয়া। আমি ও অনুসন্ধ হইয়া পড়িতেছি, অতঃপর এ শরীরট। হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি আলাদা ঘর-কল্লা করিগে—সে কিরূপ ছেলে মানুষের মত কথাটা হয়। সে যতই বাঁকিতে থাকুক, যতই গা মোড়া দিক, খানিকটা পর্যন্ত তাহার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন হই-বার ক্ষমতা তাহার হাতে নাই। সমস্ত শরীরের
ধর্ষ ।

স্মরণ তাহার সহিত লিপ্ত, এবং তাহার স্মৃতি সমস্ত শরীরের সহিত লিপ্ত। জগতের এই পরমাণুর হইতে একটি পরমাণু যদি কেহ সরাইয়া পারিত তবে আর এ জগৎ কোথায় থাকিত! তেমনি এক জনের খেলায়ের উপরে মাত্র নির্ভর করিয়া জগতের হিসাবে একটি জীবাঙ্কা কম পড়িতে পারে এমন সম্ভাবনা যদি থাকে, তাহা হইলে সমস্ত জগতটা ‘ফেল’ হইয়া যায়। কিন্তু জগতের খাতায় এরূপ বিশৃঙ্খল। এরূপ ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের বুঝ। উচিত জগতের বিরোধী হওয়াও যা’ নিজের বিরোধী হওয়াও তা’, জগতের সহিত আমাদের এতৈ একা।

যে পথে তপন শরীর আলো ধর'রে আছে,
সে পথ করিয়া তৃচ্ছ, সে আলো তাজ্জিয়া,
কুঁড়ে এই আপনার খেদ্যাত আলোকে।
কেন্দ্র অন্ধকারে মরি পথ ধুঁজে ধুঁজে!

* * *

পাখী যেবে উড়ে যায় আকাশের পানে,
সেও তাবে এমন বুঝি পৃথিবী তাজিয়া।
যত ওড়ে, যত ওড়ে, যত উড়ের যায়
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না তোজিতে
অবশেষে শান্ত দেহে নীড়ে ফিরে আসে।

জগতের ধর্ম।

অতএব প্রকৃতির মধ্যে যে ধ্রুব বর্তমান,
দেদুপূর্বক সচেতনে সেই ধ্রুবের অনুগামী
হওয়াই ধর্ম। ধর্মের শব্দের অর্থই দেখ না কেন।
যাহাতে আবরণ বা নিবারণ করে তাহাই বর্ধন,
যাহাতে ধারণ করে তাহাই ধর্ম। ডোবাভিকেশের
ধর্ম কি? যাহা অভ্যন্তরে বিরাজ করিয়া। সেই
ডোবাকে ধারণ করিয়া আছে; অর্থাৎ যাহার প্রভাবে

সেই ইথের প্রবন্ধ খাড়া হইয়াছে। জগতের ধর্ম কি? ভগৎ যে অচল নিয়নের উপর অশ্রুয় করিয়া বর্তমান রহিয়াছে তাহাই জগতের ধর্ম, এবং তাহাই জগতের প্রত্যেক অণু-কণার ধর্ম।

উদাহরণ।

একটি উদাহরণ দিই। জগতের একটি প্রধান ধর্ম পরাধিক। পার্থিক জগতের ধর্ম। এই নিমিত্ত জগতের কোথাও স্বাধিক নাই। পরের জন্য কাজ করিতেই হইবে তা'ই হইব। কর আর না কর। জগতের প্রত্যেক পরমাণু তাহার পরবর্তী ও তাহার নিকটবর্তীর জন্য, তাহার নিজের মধ্যে তাহার বিরাম নাই। তাহার প্রত্যেক কার্ষ্য অনন্ত জগতের লক্ষকোটি স্নায়ুর মধ্যে ত্যাগিত হইতেছে। একটি বালুকা যদি কেহ ধ্রুব করিতে
পারে তবে নিখিল এক্ষণের পরিবর্তন হইয়া যায়। তুমি স্বার্থপরভাবে বিদ্যা উপার্জন ও মনের উন্নতি সাধন করিলে, কিন্তু জ্ঞানিতেও পারিলে না, সে বিদ্যার ও সে উন্নতির লক্ষকোটি উত্তরাধিকারী আছে। তুমি দুই না দুই তোমার সম্ভান শ্রেণীর মধ্যে সে উন্নতি প্রাপ্ত হইবে। তোমার আশেপাশে চারিদিকে সে উন্নতির চেয়ে লাগিবে। তুমি ত দুই দিনে পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িবে, কিন্তু তোমার জীবনের সমস্ত পৃথিবীর জন্য রাখিয়া যাইতে হইবে—তুমি মরিয়া গেলে বিলয়। তোমার জীবনের এক মূহূর্ত হইতে ধরণীকে বিক্ষিত করিতে পারিবে না, প্রকৃতির আইন এমনি করাকুড়।

সচেতন ধর্ম।

অতএব এ জগতে স্বার্থপর হইবার যে নাই। পরার্থপরতাই এ জগতের ধর্ম। এই নিমিত্তই
মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম পরের জন্য আত্মোৎসর্গ কর। জগতের ধর্ম আমাদিগকে আগে হইতেই পরের জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা জগতের জড়াদিপি জড়ের সমতুল্য। কিন্তু আমরা যখন সংস্কারে সচেতনে সেই মহালোকের অনুগমন করি তখনই আমাদের মহৎ, তখনই আমরা জড়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেবল তাহাই নয়, তখনই আমরা মহৎ স্থখ লাভ করি। তখনই আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণতঃ সমস্ত জগৎকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া তাহার স্বার্থে অতি সুন্দর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। কিন্তু পারিব কেন? অহিন্নি অশান্তি, অসুখ, হৃদয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিছুতেই তাহার আরাম থাকে না। যতই সে উপাসনা করিতে থাকে যতই সে সক্ষম করিতে থাকে, ততই তাহার ভার বৃদ্ধি হইতে থাকে মাত্র। কিন্তু যখনি আপনাকে
যুলিয়া। পরের জন্য প্রাণন্ত করি তখনি দেখি
সম্পর্কে সীমায় নাই। তখনি সহস্য অনুভব করিতে
থাকি, সমস্ত জগৎ আমার স্পর্শে। আমি
ছিলাম সূর্য হইলাম অত্যন্ত বৃহৎ। চন্দ্র সূর্যের
সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল।

জগত স্রোতে ভেসে চল
সে যেখা আছ তাই,
চলেছে যেখা রবিশ্বশি
চলে সেখা যাই!

অপক্ষপাত।

জগত ত কাহাকেও একত্রে করে না,
কাহারো দোপা নাপিত বন্ধ করে না। চন্দ্র
সূর্য গৌরব হই, জগতের সমস্ত শক্তি সমগ্রের
এবং প্রত্যেক অংশের অবিশ্রাম সমান দাসত্ব
করিতেছে। তাহার কারণ এই জগতের মধ্যে
যে কেহ বাস করে, কেহই জগতের বিরোধী নহে। পাপী অসাধুর। জগতের নীচের ক্লাশে পড়ে মাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া ত তাহাদিগকে ঈশ্বর হইতে তাড়াইয়া দিতে পারা যায় না। বাইবেলের অন্য নরক একটা সামাজিক জুড় বইত আর কিছু নয়। পাপ নাকি একটা অভাব মাত্র, এই নিমিত্তে যে এত দুর্বল যে তাহাকে পিয়া। মারিয়া ফেলিবার জন্য একটা অন্য জাতীয় আবশ্যক করে না। সমস্ত জগত তাহার প্রতিকূলে তাহার সমস্ত শক্তি অহর্নিশি প্রয়োগ করিতেছে। পাপ পুরো পরিণত হইতেছে, আন্তর্জাতিক বিশ্বাসবিহিত দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

সকলে আত্মীয়।
নিতান্ত দূষণ করিয়া আর কাহাকেও একে-বারে পর মনে করা শোভা পায় না। সকলেরই
মধ্যে এত ঐক্য আছে। দুঃখের মস্তি লোক হইতে পারেন তাই বলিয়া যে গোবরের সঙ্গে সমস্ত আদর্শ প্রদান করা বন্ধ করিয়া দিবেন ইহা তাহার মত উন্নতিশীলের নিতান্ত অনুপযুক্ত কাজ!

জড় ও অত্মা।

পূর্বেই ত বলিয়াছি আমাদের অধিকাংশই অচেতন, একটুখানি চেতন মাত্র। তবে আর জড়কে দেখিয়া নাসা কুক্তি করা কেন? আমরা একটা প্রকার জড় তাহারই মধ্যে এককত্তি চেতনা বাস করিতেছে। অত্মায় ও জড়ে যে বাস্তবিক গাঢ়তিক প্রভেদ আছে তাহা নহে। অবস্থানগত প্রভেদ মাত্র। আলোক ও অদ্বঞ্চকে এতই প্রভেদ যে মনে হয় উভয় বিরোধীপক্ষ। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, আলোকের অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসই
অঙ্ককার এবং অঙ্ককারের অপেক্ষাকৃত উদামই আলোক। তেমনি আলোকও নিদ্রায় জড়ত এবং জড়ের চেতনাই আলোকার ভাব।

বিজ্ঞান বলে সৃষ্টিকরণে অঙ্ককার রশ্মি বিষ্ট্র, আলোক-রশ্মি তাহার তুলনায় চের কম; একটি খানি আলোক অনেকটা অঙ্ককারের মুখ-পাতের স্রোত। তেমনি আমাদের মনেও একটু খানি চৈতন্যের সহিত অনেকখানি অচৈতন্য জড়িত রহিয়াছে। জগতেও তাহাই। জগৎ একটি প্রকাণ গোলাকার কুঁড়ি, তাহার মুখের কাছে দেখা দেখা দিয়াছে। দেই মুখের কুঁড়ি যদি উদ্দেশ্য হইয়া বলে আমি মন্ত-লোক, জগৎ অতি নীচ, উহার সংগর্ভে থাকিবার, আমি আলাদা হইয়া যাইব, তবে সে কেমনতর শোনায়?
ধর্মকে আঁটায় করিলে মৃত্যুভাব থাকে না।
এখানে মৃত্যু অর্থে ধৃঢ় নহে, মৃত্যু অর্থে অবস্থানীয় পরিবর্তনও নহে, মৃত্যু অর্থে জড়তা। অচেতন-তাই অখণ্ড। ধর্মকে যতই আঁটায় করিলে থাকিব, ততই চীতনা লাভ করিলে থাকিব, ততই অনুভব করিলে থাকিব, যে মহা-চীতনের সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত হইয়াছে, আমার মধ্য দিয়া এবং আমাকে প্রাপ্ত করিয়া দেই চীতনের স্নেত প্রবাহিত হইতেছে। যথার্থ জগৎকে আমার দ্বারা জানিবার কোন সন্দেহন নাই, চীতনা দ্বারা জানিতে হইবে।

জগতের সহিত এক।

জগতের কাঠগড় দাঁড় করাইয়া সঙ্গে-সঙ্গে করাইলে সে খুব অল্প কথাই বলে, জগতের
ঘরে বাস করিলে তবে তাহার যথার্থ ঘর পাওয়া যায়। তাহা হইলে জগতের হৃদয় তোমার হৃদয়ে তরঙ্গিত হইতে থাকে; তখন তুমি যে কেবল মাত্র তর্ক দ্বারা জ্ঞানকে জান তাহা নহে, হৃদয়ের দ্বারা জ্ঞানকে অনুভব কর। আমরা যে কিছুই জ্ঞানের পারি না তাহার ওধান কারণ আমরা নিজেকে জ্ঞাত হইতে বিচিত্র করিয়া দেখি, যখন হৃদয়ের উপর সহকারে জগতের সহিত অনন্ত ঐকা মন্দিনার মধ্যে অনুভব করিতে থাকি, তখন জগতের হৃদয়-সমুদ্র সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া আমার মধ্যে উঠিলিত হইয়া উঠিবে, আমি কতবার জ্ঞান করত খানি পাইব তাহার সীমা নাই। একটিখানি বুদ্ধির মত অহংকার ফুলিয়া উঠিয়া যত্নে অভিমানে জগতের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া বেড়াইলে মহৎ ও নাই, স্থথও নাই। জগতের সহিত এক হইবার উপায়
মূল ধর্ম।

একজন বলিতেছেন, যখন প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্রই নৃশংসতা দেখিতেছি, তখন নিষ্ঠৃত যে জগতের ধর্ম নহে, এ কে বলিতেছে? জগতের অশ্রুত অন্য বলিতেছে। নিষ্ঠৃতাই যদি জগতের মূলগত নিয়ম হইত, হিংসাই যদি জগতের অশ্রুষ্ঠ হইত তবে জগৎ এক মুহূর্ত বাচিত না। উপর হইতে যাহা দেখি তাহা ধর্ম নহে। উপর হইতে আমরা ত চতুর্দিকে পরিবর্তন দেখিতেছি কিন্তু জগতের মূল ধর্ম কি অপরিবর্তনীয় না হে? আমরা চারিদিকেই ত অনেকা দেখিতেছি, কিন্তু তাহার মূলে কি এক্ষা-
বিরাজ করিতেছে না? তাহা যদি না করিত, তাহা হইলে এ জগৎ বিশ্বব্যাপী নরকরাজ্য হইত, সুন্দরভয়ের স্বর্গরাজ্য হইত না। তাহা হইলে কিছু হইতেই পারিত না, কিছু থাকিতেই পারিত না।

একটি রূপক।

অনেক লোক আছেন, তাহারা জগতের সর্বত্রই অমঙ্গল দেখেন। তাহাদের মুখে জগতের অবস্থা যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে তাহার আর এক মুহূর্ত টিকিয়া থাকিবার কথা নহে। সর্বত্রই যে শোক তাপ দুঃখ-যন্ত্রণা দেখিতেছি এ কথা অনুকূল করা যায় না কিন্তু তবুও ত জগতের সঙ্গীত থাকে নাই! তাহার কারণ, জগতের প্রাণের মধ্যে গভীর অনন্দ বিরাজ করিতেছে। সে অনন্দানন্দেকে কিছুতেই আচ্ছান্ন করিতে পারিতেছে না, বরং যত কিছু
শোকতাপ সেই দীপ্ত আনন্দে বিলীন হইয়া যাইতেছে। শিবের সহিত জগতের তুলনা হয়। অসীম অন্ধকার-দিক-বন পরিয়া। ভূতনাথ-পশু-পতি জগৎ কোটি কোটি ভূত লইয়া। অনন্ত তাওবে উন্মত্ত। কঠিন মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে তবু নৃত্য। বিষয়ধর সর্ব তাহার অন্তর ভূষণ হইয়া রহিয়াছে, তবু নৃত্য। মরণের রংভূমি শ্রাষ্ট্রের মধ্যে তাহার বাস, তবু নৃত্য। মৃত্যু-স্রোপিনী কালী তাহার বক্ষের উপরে সবর্বদ। বিচরণ করিতেছেন, তবু তাহার আনন্দের বিরাম নাই। যাহার প্রাণের মধ্যে অমৃত ও আনন্দের অনন্ত প্রসবন, এত হলাহল এত অমঙ্গল তিনিই যদি ধারণ করিতে না পারিবেন তবে আর কে পারিবে। সর্পের ফণা, হলাহলের নীলভূতি বাহির হইতে দেখিয়া আমরা শিবকে দুঃখী মনে করিতেছি কিন্তু তাহার জটামালের মধ্যে প্রচুর
চির-স্রোত অমৃত-নিসাধিনী পুণ্য ভাগীরথীর অনন্দ কল্লৌল কি শুনা যাইতেছে না? নিজের ভয়রূপ নিজে, নিজের অমৃত হর্ষগানে উষ্ণত হইয়া নিজে যে অবিশ্রাম মৃত্যু করিতেছেন, তাহার গভীর কারণ কি দেখিতে পাইতেছি? বাহিরের লোকে তাহাকে দরিদ্র বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু তাহার গৃহের মধ্যে দেখ দেখি, অম্পূর্ণ। চিরদিন অধিষ্ঠান করিতেছেন। আর এ যে মলিনতা দেখিতেছে, শশিশিনের ভগ্ন দেখিতেছে, মৃত্যুর চিহ্ন দেখিতেছে, ও কেবল উপরে—এ শশিশিন ভগ্নের মধ্যে আচ্ছন্ন রজত-গিরি-নিভ চারু চন্দ্রাবতঃ অতি সুন্দর অমর রপু দেখিতেছে না কি? উনি যে মৃত্যুঞ্জয়; আর, মৃত্যুকে কি আমরা চিনি? আমরা মৃত্যুকে করাল-দশন লোল-রসনা মুর্তিতে দেখিতেছি, কিন্তু এ মৃত্যুই ইহার প্রিয়তমা, এ মৃত্যুকে বক্ষে ধরিয়া ইনি
আনন্দে বিহ্রব হইয়া আছেন। কালীর যথার্থ
সরূপ আমাদের জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই,
আমাদের চক্ষে তিনি মৃত্যু আকারে প্রতিভাত
হইতেছেন, কিন্তু ভক্তরা জানেন কালীও যাও
গৌরাঙ্গ তাই; আমরা তাহার করালমূর্তি দেখি-
তেছি, কিন্তু তাহার মোহিনীমূর্তি কেহ কেহ বা
দেখিয়া থাকিবেন। শিবকে সকলে যোগী
বলে। ইনি কাহার যোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন?
যোগী হে, কে তুমি ছদ্ম আসনে,
বিরুতিভূষিত শুভ্রদেহ, নাচিছ দিক বসনে।
মহা আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উখলি উচ্চলি যায়,
তালে শিশু শশি হাসিয়া চায়
জটাজট ছায় গগণে।
সৌন্দর্য্য ও প্রেম।

সৌন্দর্য্যের কারণ।

পূর্বে এক স্থানে বলিয়াছি, যে, যখন জগ-তের স্পর্শকে থাকি, তখনই আমাদের প্রকৃত স্বখ, যখন স্বাভাবিক শুধু জিয়া মরি তখনই আমাদের ক্রেশ, শ্রান্তি, অসন্তোষ। ইহা হইতে আর-একটা কথা মনে আসে। যাহাদিগকে আমরা সুন্দর বলি তাহাদিগকে আমাদের কেন ভাল লাগে?

পণ্ডিতেরা বলেন, যে সুন্দর তাহার মধ্যে বিষম কিছুই নাই;—তাহার আপনার মধ্যে আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য; তাহার কোন-একটি অংশ অপর-একটি অংশের সহিত বিভাজ করে না; জেদ করিয়া অন্য সকলকে ছাড়াইয়া। উঠে
না; ঈশ্বরের নাম অনন্ত, সৃষ্টি হইয়া মুখ বাঁকাইয়া থাকে না। তাহার প্রত্যেক অংশ সমগ্র সৃষ্টি সৃষ্টি; তাহার কোন অংশই সৃষ্টির অংশ না। তাহার সৃষ্টিকে অনন্ত বলি না। তাহার সৃষ্টিকে সৃষ্টিকে করিয়া তুলিবার জন্য তাহার। যদি সৃষ্টি বিষয় হইত, তাহার। যদি সকলকে মনে করিত আর সকলের চেয়ে আরম্ভ মন্দ লোক হইয়া। উঠিব, এক জন আর এক জনকে না মানিত, তাহা হইলে, না। তাহার। নিজে সৃষ্টি হইত, না। তাহাদের সমগ্র সৃষ্টি হইয়া। উঠিত। তাহা হইলে একটা বাঁকাইয়া। হঁস দীর্ঘ উঁচু নিচু বিশ্বস্ত চক্ষুশূল জীবনোদগ করিত। অতএব দেখা যাইতেছে, যথার্থ যে সৃষ্টি সে প্রেমের আদর্শ। সে প্রেমের প্রতাবেই সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার আদর্শময় প্রেমের সুরে গাঁথা; তাহার কোন ধানে বিরোধ বিশ্বে নাই।। প্রেমের সত্ত্বনা একটি বৃষ্টির উপরে।
কি মধুর প্রেম মিলিয়া থাকে। তাই তাহাকে দেখিয়ে ভাল লাগে। তাহার কোমলতা মধুর, কারণ 'কোমলতা প্রেম, কোমলতা কাহাকেও আবাত করে না, কোমলতা সকলের গায়ে করুণ হস্তক্ষেপ করে, সে চোখের পাতায় স্নেহ আকর্ষণ করিয়া আনে। ইন্দ্রধনুর রংগুলি প্রেমের রং তাহাদের মধ্যে কেমন মিল। তাহারা সকলেই সকলের জন্য অজায়গা রাখিয়াছে, কেহ কাহাকেও দূর করিতে চায় না, তাহারা স্রু-বালিকাদের মত হাত-ধরার্থির করিয়া। দেখা। দেখা, গলাগলি করিয়া মিলাইয়া যায়। গানের স্রু-গুলি প্রেমের স্রু, তাহারা সকলে মিলিয়া খেলা-ইতে থাকে, তাহারা পরস্পরকে সাজাইয়া। দেয়, তাহারা আপনার সঙ্গীদের দূর হইতে ডাকিয়া। আনে। এই অন্যান্য সৌন্দর্য মনের মধ্যে প্রেম জন্মাইয়া দেয়, সে আপনার প্রেমে অন্যকে
প্রেমিক করিয়া তুলে, সে আপনি স্ন্দর হইয়া অন্যকে স্ন্দর করে।

সৌন্দর্য্য বিদ্যমানী।

যে স্ন্দর, কেবল যে তাহার নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাহা নয়;—সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য সমস্ত জগতের সঙ্গে। সৌন্দর্য্য জগতের অনুকুল। কদর্যাত্মা সযতানের দলভ্রুক। সে বিদ্রোহী। সে যে টিকিয়া থাকে সে কেবল মাত্র গায়ের জ্যোল। তাও সে খাওয়া না, কারণ, কততুকুই বা তাহার গায়ে জ্যো। কিন্তু প্রকৃতি তাহা হইতেও রুঁজি সৌন্দর্য্য অভিব্রুক্ত করিবেন।

মনের মিল।

জগতের সাধারণের সহিত সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য ঐক্য আছে। জগতের সর্বত্রই তাহার তুলনা তাহার দোষের মেলে। এই জন্য সৌন্দর্য্যকে
সকলের ভাল লাগে। সৌন্দর্য যদি একেবারেই নুতন হইত, খাপছাড়া হইত, হটাত বাবুর মত একটি কিন্তু পদার্থ হইত, তাহা হইলে কি তাহাকে আর কাহারো ভাল লাগিত?

আমাদের মনের মধ্যেই এমন একটা জিনিস আছে, সৌন্দর্যের সহিত যাহার অভ্যস্ত এঁকা হয়। এজন্য সৌন্দর্যকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ "আমার মিত্র" বলিয়া মনে হয়। জগতে আমরা "সদৃশকে" খুঁজিয়া বেড়াই। যথার্থ সদৃশকে দেখিলেই হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ডাকিয়া। আর, কিন্তু সৌন্দর্যের মধ্যে যেমন আমাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাই, এমন আর কোথায়? সৌন্দর্যকে দেখিলে তাহাকে আমাদের "মনের মত" বলিয়া মনে হয় কেন? সেই আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মেলে, কদর্যাত্মক তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হয় না।
আমরা সকলেই যদি কিছু না কিছু সুন্দর হইতাম, তাহা হইলে সুন্দর তাল বাসিতাম না।

উপযোগিতা।

যাহা আমাদের উপকারী ও উপযোগী, তাহাই কালক্রমে অভ্যাসবশতঃ আমাদের চক্ষে সুন্দর বলিয়া। প্রতীত হয় ও বংশ পরম্পরায় সেই প্রতীতি প্রবাহিত ও পরিপূর্ণ হইতে থাকে, একুশে কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে লোকে অবসর পাইলে ফুলের বাগানে বেড়াইতে না গিয়া ময়লার দোকানে বেড়াইতে যাইত, ঘরের দেয়ালে লুচি চাঁপাইয়া রাখিত ও ফুলদানীর পরিবর্তে সন্দেশের হাঁড়ি টেবিলের উপর বিরাজ করিত।

আমরা সুন্দর।

প্রকৃত কথা এই যে আমরা বাহিরে যেমনই হই না কেন, আমরা বাস্তবিকই সুন্দর। সেই
জন্য সৌন্দর্যের সহিতই আমাদের যথার্থ এক্য দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য-চেতনা সকলের কিছু সমানু নয়। যাহার হৃদয়ে যত সৌন্দর্য বিরাজ করিতেছে, সে ততই সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারে। সৌন্দর্যের সহিত তাহার নিজের এক্য ততই সে রূখিতে পারে, ও ততই সে আনন্দ লাভ করে। আমি যে, ফুল এত ভালবাসি তাহার কারণ আর কিছু নয়, ফুলের সহিত আমার হৃদয়ের পৃষ্ঠ একটি এক্য আছে—আমার মনে হয় ও একই কথা, যে সৌন্দর্য ফুল হইয়া ফুটিয়াছে, সেই সৌন্দর্যই অবস্থানে আমার হৃদয় হইয়া বিকশিত হইয়াছে; সেই জন্য ফুলও আমার হৃদয় চাহিতেছে, আমিও ফুলকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চাহিতেছি। মনের মধ্যে একটি বিলাপ উঠিতেছে—যে, আমরা এক পরিবারের লোক, তবে কেন অবস্থান্তর নামক
দেয়ালের আড়ালে পর হইয়া। বাস করিতেছি; কেন পরম্পরকে সর্বতোভাবে পাইতেছি না?

সন্দর্ভের এক্ষণে দেখিয়াই বিকটর হাগো।
গান গাহিতেছেন।
মহীয়সী মহিমার আগের কুশ্ম
সূর্যা, ধার ললিতার বিশালের ঘুম।
ভাঙ্গা এক ভিত্তি পরে ফুল শুভ্রবাদ, চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে অমর আলোকময় তপনের পানে;
ছোট মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে,
“লাবণ্য-কিরণ-ছট। আমারে ত আছে!”
“লক্ষান্তরে হর্ক্ষে জলেমু পদঃ” ইহাদের মধ্যেও, এক্ষণে।
সুন্দর সুন্দর করে।

সুন্দর আপনি সুন্দর এবং অন্যকে সুন্দর করে। কারণ, সৌন্দর্য হাদে প্রেম জাগিত করিয়া দেয়, এবং প্রেমই মানুষকে সুন্দর করিয়া তুলে। শারীরিক সৌন্দর্যও প্রেমে যেমন দীপ্তি পায় এমন আর কিছুতে না। মানুষের মিলনে যেমন প্রেম আছে, পশুদের মিলনে তেমন প্রেম নাই, এই জন্য বোধ করি, পশুদের অপেক্ষা মানুষের সৌন্দর্য পরিকুর্ত। যে মানুষ ও যে জাতি পাশ্ব, নিষ্ঠুর, হাদয়হীন সে মানুষের ও সে জাতির মুখশ্রী সুন্দর হইতে পারে না। দেখা যাইতেছে, দয়ায় সুন্দর করে, প্রেমে সুন্দর করে, হিংসায় নিষ্ঠুরতায় সৌন্দর্যের ব্যাপার জন্মায়। জগতের অনুকূলতাচরণ করিলে সুন্দর হইয়া উঠি ও প্রতিকূলতা করিলে অপর আমাদের গালে কদর্যতার চুনকালী মাখাইয়া। তাহার রাজপথে
ছাড়িয়া দেয়, আমাদিগকে কেহ সমাদর করিয়া আশ্রয় দেয় না।

শাস্ত্র।

এ শাস্ত্র বড় সামান্য নয়। আমাদের নি-জ্ঞের মধ্যে সৌন্দর্যের নূননতা থাকিলে, আমরা জগতের সৌন্দর্য-রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাই না, ধরণীর ধুলা-কাদার মধ্যে লুটাইতে থাকি। শরু শুনি গান শুনি না, চলাফিরা দেখিতে পাই নৃত্য দেখিতে পাই না, আহার করিয়া পেট ভরাই কিন্তু স্ত্রীদাদ কাহারকে বলে জানি না। জগতের যে অংশে কারাগার সেইখানে গত খুঁড়িয়া। অত্যন্ত নিরাপদে বৈষয়িক কেছো হইয়া নড়া বয়স পর্যন্ত কাটাইয়া। দিই, মৃতিকার তল-বাসী চন্দ্রবিহীন কুমিল্লের সহিত কুঠুম্বিত। করি, ও তাহাদের সহিত উজ্জ্বল বিজ্ঞিত হইয়া স্তুপাকারে নিদ্রা দিয়া।
উদ্ধার।

এই কুমিরাজ্য হইতে উদ্ধার পাইয়া আমরা
সূর্যালোকে আসিতে চাই। কে আমিবে?
সৌন্দর্য্য স্বয়ং। কারণ, অশীতীৰী প্রেম সৌন্দর্য্যে
শরীরের ধারণ করিয়াছে। প্রেম যেখানে তাহা
সৌন্দর্য্যের সেখানে তাহার অক্ষর, প্রেম যেখানে
হদয় সৌন্দর্য্যের সেখানে গান, প্রেম যেখানে ওচঞ
সৌন্দর্য্যে সেখানে শরীর, এই জন্য সৌন্দর্যে
প্রেম জাগায়, এবং প্রেমে সৌন্দর্য্য জাগাইয়া
তুলে।

কবির কাজ।

কবিদের কি কাজ, এইবার দেখা যাইতেছে।
সে আর কি নয়, আমাদের মনে সৌন্দর্য্য উদ্দেশে
করিয়া দেওয়া। উপদেশ দিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিয়া
প্রকৃতিকে মৃত্তিকারের মত কাটাকুটি করিয়া এ
উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। সৌন্দর্য উদ্দেশীকরণ করে পারে। বৈঠিকেরা বলেন ইহাতে লাভ কি? কেবলমাত্র একটি সৌন্দর্য ছবি পাইয়া, বা সৌন্দর্য কথা শুনিয়া উপকার কি হইল? কি জানিলাম? কি শিক্ষালাভ করিলাম; সংকল্পের খাতায় কোন নূতন কড়িকা জমা করিলাম? কিছুক্ষণের মত আনন্দ পাইলাম, সে ত সনেশ সাহিলেও পাই। ততক্ষণ যদি পাঁজি দেখিতাম, তবে আজকেকার তারিখ বার ও কবে চন্দ্রগৃহণ হইবে সে খবরটা জানিতে পাইতাম।

বৈঠিকেরা যাহাই বলুন না কেন, আর কোন উদ্দেশ্যের আবশ্যক করে না, মনে সৌন্দর্য উদ্দেশক করাই যথেষ্ট মহৎ। কবিতার ইহা অপেক্ষা। মহত্ত্ব উদ্দেশ্য আর থাকিতে পারে না। সৌন্দর্য উদ্দেশক করার অর্থ আর কিছু নয়—হৃদয়ের অসাধ্য। অচেতনতার বিরুদ্ধে
সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া। নে কার্যে যাঁহারা ছাড়া, তাহাদের সহিত একটি ময়রার তুলনা চিক থাকে না।

অতএব কবিদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তাহারা কেবল সৌন্দর্য ফুটাইতে থাকুন—জগতের সর্বস্ত্র যে সৌন্দর্য আছে, তাহা তাহাদের হৃদয়ের আলোকে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে থাকিয়া, তবেই আমাদের প্রেম আজিমা উঠিবে প্রেম বিশ্বাসে হইয়া পড়িবে।

কবিতা ও তত্ত্ব।

কবির। যদি একটি তত্ত্ববিশেষের সমুদ্ধ থাক্তা করিয়া তাহারই গায়ের মাটে চৌম্বকোগুলি করিয়া কবিতার মেরুজাই ও পায়জামা বানাইতে থাকেন, ও সেই পোষাকে স্মৃতিজ্ঞত করিয়া। তত্ত্বকে
কবিতা ও তত্ত্ব।

সমাজে ছাড়িয়া দেন, তবে সে তত্ত্বগুলিকে কেমন খোকা-বাবুর মত দেখায় ও সে কাজটাও ঠিক কবির উপযুক্ত হয় না। এক একবার এমন দক্ষার্থতা করিতে দেয় নাই, এবং মোটা মোটা বয়স্ক তত্ত্বের যদি মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান-বিশেষের সময়ে তাহাদের থানাধূতি ছাড়িয়া এইরূপ পোঠাক পরিয়া সভায় আসিয়া। উপস্থিত হন, তাহাতেও তেমন আপত্তি দেখিতে না। কিন্তু এই যদি প্রথা হইয়া পড়ে, কবিতাটি দেখিলেই যদি দশজনে পড়িয়া তাহার খোলা ও শাঁস ছাড়াইয়া ফেলিয়া। তাহ। হইতে তত্ত্বের আঁটি বাহির করাই প্রধান কর্তব্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে নিশ্চিয়ই ক্রমে এমন কলের চাস। হইতে আরম্ভ হইবে, যাহার আঁটিটাই সমস্ত, এবং যে সকল কলের মধ্যে আঁটির বাহ্যল্য থাকিবে না শাঁস এবং মধুর রসই অধিক তাহারা নিজের
অঠিক-দরিদ্র অস্তিত্ব ও মাধুর্য্য রসের আধিকা লইয়া নিষ্ঠানাট্স লক্ষ্য অনুভব করিবে। তখন গহনা-পরা গরবিনীকে দেখিয়া। ভূবনমোহিনী রূপসীরাও ঈর্ষ্যাদৃগ হইবে।

তত্ত্বের বাংল্যকা।

তত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞান পুরাতন হইয়া যায়, মৃত হইয়া যায়, মিথ্যা হইয়া যায়। আজ যে জ্ঞানটি নানা উপায়ে প্রচার করিবার অবশ্যক থাকে, কাল আর থাকে না, কাল তাহা সাধারণের সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে, কাল যদি পুনশ্চ সে কথা উত্থাপন করিতে যাও তবে লোকে তোমাকে মারিতে আসে, বলে “আমি কি জ্ঞান হইতে নামিয়া। আসিলাম, না আমি কাল অষ্ঠলগ্রহণ করিয়াছি?” জ্ঞান একটু পুরাতন হইলেই তাহার পুনরুজ্জি আর কাহারও সহ্য হয় না।
অনেক জ্ঞান কালক্রমে লোপ পায়, পরিবর্তিত হইয়া যায়, মিথ্যা হইয়া পড়ে। এমন একদিন ছিল যখন, আমরা শ্রবণ যে কানেই শুনি সর্বাঙ্গ দিয়া শুনি না, এ কথাটাও নূতন সত্য ছিল। তখন এ কথাটা প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে হইত। কিন্তু হৃদয়ের কথা চিরকাল পুরাতন এবং চিরকাল নূতন। বাল্মীকির সময়ে যে সকল তথ্য সত্য বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহাদের অনেকগুলি এখন মিথ্যা বলিয়া স্বীয় হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীন ঋষি-কবি হৃদয়ের যে চিত্ত দিয়াছেন, তাহার কোনটাই এখনও অপ্রচলিত হয় নাই।

অতএব জ্ঞান কবিতার বিষয় নহে। কবিতা চিরযৌবন। এই বুড়ার সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে অল্পবয়সে বিধবা ও অনৃহত্তা করা উচিত হয় না।
সৌন্দর্যের কাজ।

প্রকৃতির উদেশ্য—জানান’ নহে অনুভব করান’। চারিদিক হইতে কেবল নানা উপায়ে হ্রদয় আকর্ষণের চেষ্টা হইতেছে। যে জড়- হ্রদয় তাহাকেও মুসল্ক করিতে হইবে, দিবানিশি তাহার কেবল এই যত্ন। তাহার প্রধান ইচ্ছ।
এই যে, সকলের সকল ভাল লাগে, এত ভাল লাগে যে আপনাকে বা অপরকে কেহ যেন বিনাশ না করে, এত ভাল লাগে যে সকলে সকলের অনুকূল হয়। কারণ এই ইচ্ছার উপর তাহার সমস্ত শুভ তাহার অস্তিত্ব নিন্দর করিতেছে। প্রথম অবস্থায় শাসনের দ্বারা প্রকৃ-তির এই উদেশ্য সাধিত হয়। প্রথমে দেখিলে, জগৎকে বুদ্ধি মারিলে তোমার মুষ্টিতে গুরুতর আঘাত লাগে, ক্রমে দেখিলে জগ-
তের সাহায্য করিলে সেও তোমার সাহায্য করে। এরূপ শাসনে এরূপ স্বার্থপরতায় জগতের রক্ষা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে আনন্দ কিছুই নাই, তাহাতে জড়ত্ব ও দাসত্বই অধিক। এই জন্য প্রকৃতিতে যেমন শাসনও আছে তেমনি সৌন্দর্যও আছে। প্রকৃতির অভিপ্রায় এই, যাহাতে শাসন চলিয়া গিয়া সৌন্দর্যাল বিস্তার হয়। শাসনের রাজদুঃ কাড়িয়া। লইয়া সৌন্দর্যের মাধ্যমে রাজত্ব ধরাই প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য। প্রকৃতি যদি নিষ্ঠুর শাসনপ্রিয় হইত, তাহা হইলে সৌন্দর্যের আবশ্যকতা থাকিত না। তাহা হইলে প্রভাত মধুর হইত না, ফুল মধুর হইত না, মনুষ্যের মুখশ্রী মধুর হইত না। এই সকল মাধুর্যের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমরা ক্রমশঃ সাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। আমরা তালবাসির বলিয়া জগতের হিত সাধন।
করিব। তখন ভয় কোথায় থাকিবে! তখন সৌন্দর্যা জগতের চতুর্দিকে বিকিরিত হইয়া উঠিয়াছে! অথবা আমাদের হৃদয়-কমল-শায়ী স্বপ্ন সৌন্দর্যা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি আগিয়াই আমাদের চতুর্দিককে শাসনের সিপাহী-গুলোর নাম কাটিয়া দিয়াছেন জগতের চারিদিকে তাহার জয়জয়কার উঠিয়াছে।

স্বাধীনতার পথ প্রদর্শন।

কবিরা সেই সৌন্দর্যের কবি, তাহারা সেই স্বাধীনতার গান গাহিতেছেন, তাহারা সজ্জীব মন্ত্রবলে হৃদয়ের বক্ষে মোচন করিতেছেন। তাহারা সেই শাসনহীন স্বাধীনতার জন্য আমাদের হৃদয়ে সিংহাসন নির্মাণ করিতেছেন, সেই মহারাজ। কর্তৃক রক্তপাতহীন জগতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন; কবিরা তাহারই
সৈন্য। তাহার উপদেশ দিতে আসেন নাই।
সজীবতা ও সৌন্দর্য্য লাভ করিবার জন্য কখন
কখন তত্ত্ব তাহাদের ঘাটে আসিয়া। উপস্থিত হয়,
তাহারা তত্ত্ব কাছে কখন উমেদারী করিতে
যান না। কবিরা অমর, কেন না তাহাদের
বিষয় অমর, অমরতাকে আশ্রয় করিয়াই তাহারা
গান গাহিয়াছেন। ফুল চিরকাল ফুটিবে, সমীরণ
চিরকাল বাহিবে, পাখী চিরকাল ভাবিবে, এবং
এই ফুলের মধ্যে কবির মুর্তি বিকশিত, এই সমী-রণের মধ্যে
কবির মুর্তি প্রবাহিত, এই পাখীর
গানে কবির গান বাজিয়া। ওঠে। কবির নাম
নিজীব পাথরের মধ্যে খোদিত নহে, কবির নাম
প্রভাতের নব নব বিকশিত বিচিত্রবর্ণ ফুলের
অক্ষরে প্রতাহ নৃতন করিয়া। লিখিত হয়। কবি
প্রিয়, কারণ, তিনি যাহাদিগকে ভাল বাসিয়া
কবি হইয়াছেন, তাহারা চিরকাল প্রিয়, কোন
কালে তাহারা অপ্রিয় ছিল না, কোন কালে তাহারা অপ্রিয় হইবে না ।

পুরাতন কথা ।

যাহারা বলেন সকল কবিরা ঐ এক কথাই বলিয়া আসিতেছেন, মূতন কি বলিতেছেন ? তাহাদের কথার আর উত্তর দিবার কি আবশ্যক আছে ? এক কথায় তাহাদের উত্তর দেওয়া যায়।
পুরাতন কথা বলেন বলিয়াই কবিরা কবি।
তাহারা মূতন কথা বলেন না। মূতনকে বিখ্যাত করে কে ? মূতনকে অসন্ধারিতে প্রাণের অস্তঃ-পূর্ণের মধ্যে কে তাকিরা লইয়া যাইতে পারে ?
তাহার বংশাবলীর খবর রাখে কে ? কবিরা এমন পুরাতন কথা বলেন, যাহা আমার পক্ষেও খাটে তোমার পক্ষেও খাটে; যাহা আজও আছে, কালও ছিল, আগামী কালও থাকিবে ? যাহাঁ
আজও আছে, কালও ছিল, আগামী কালও ধাকিবে। যাহা শুনিবারা শ্রদ্ধার অতীত হইতে
শ্রদ্ধার ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সকলে সম্মরে বলিয়া
উঠিতে পারে ঠিক কথা! যাহা শুনিয়া আমরা
সকলেই আনন্দে বলিতে পারি—পরের হৃদয়ের
সহিত আমার হৃদয়ের কি অশ্চর্চা যোগ, অতীত
কালের হৃদয়ের সহিত বর্তমান কালের হৃদয়ের
kি অশ্চর্চা ঐক্য। হৃদয়ের ব্যাপ্তি মুহূর্তের
মধ্যে বাড়িয়া যায়।

জ্ঞান ও প্রেম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্ঞানে প্রেমে অনেক
প্রভেদ। জ্ঞানে আমাদের ক্ষমতা বাড়ে, প্রেমে
আমাদের অধিকার বাড়ে। জ্ঞান শরীরের মত,
প্রেম মনের মত। জ্ঞান কুস্তি করিয়া জয়ী হয়,
প্রেম সৌন্দর্যের দ্বারা জয়ী হয়। জ্ঞানের দ্বারা

৮
জ্ঞান যায় মাত্র, প্রেমের দ্বারা পাওয়া যায়। জ্ঞানের তিন বৃদ্ধি করিয়া দেয়, প্রেমের দ্বারা যৌবন জীবন রাখে। জ্ঞানের অধিকার যাহার উপরে তাহা চঞ্চল, প্রেমের অধিকার যাহার উপরে তাহা ক্ষেত্র। জ্ঞানীর সুখ আত্মগৌরবের নামক ক্ষমতার সুখ, প্রেমের সুখ আত্ম বিসর্জন নামক স্বাভাবিকতার সুখ।

নগদ কথা।

জ্ঞান যায়। জ্ঞানে তাহা প্রকৃত জ্ঞানই নয়, প্রেম যায়। জ্ঞানে তাহাই সুস্থতা জ্ঞান। একজন জ্ঞানী ও প্রেমের দ্বারা এই সমস্তকে একটি পারস্য কবিতার চমৎকার ব্যাখ্যা। শুনিয়াছিলাম, তাহার মর্ম লিখিয়া দিতেছি।

পারস্য কবি এইরূপে একটি ছবি দিতেছেন যে, বৃদ্ধ পকেতের জ্ঞান তাহার লেহার সিন্ধুকে
চাবি লাগাইয়া বসিয়া আছে; হাতয় "নগদ কড়ি দাও" "নগদ কড়ি দাও" বলিয়া তাহারই কাছে গিয়া। উপস্থিত হইয়াছে, প্রেম এক পাশে বসিয়া-চুড়ি ছিল, সে হাসিয়া বলিতেছে "মুক্তি।"

অর্থাৎ জ্ঞান নগদ কড়ি পাইবে কোথায়। সে ত কতকগুলো। নোট দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই নোট তুঙ্গাইয়া দিবে এমন পোদার কোথায়। জ্ঞানেতে কেবল কতকগুলো। চিহ্ন দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই চিহ্নের অর্থ বলিয়া দিবে কে? জগতের সকল ব্যাপকে নোটই দেখিতেছি, চিহ্নই দেখিতেছি, হাতয় ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, নগদ কড়ি পাইব কোথায়? প্রেমের কাছে পাইবে।

আংশিক ও সম্পূর্ণ অধিকার।

যেমন শরীরের দ্বারা শরীরকেই আয়ত্ত করা যায় তেমনি জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যবস্ত্র উপরেই
ক্ষমতা জন্মে, মন্দ্বর মধ্যে তাহার স্বেশ নিষেধ।

একজন ইংরেজ কীর্তির এই সম্পত্তি যাহা বলিতেছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।
ইহার মন্দ্বর এই যে, যদি অংশ চাও তবে জ্ঞান বা শরীরের দ্বারা পাইবে তাও ভাল করিয়া পাইবে না যদি সমস্ত চাও তবে মন বা গ্রেমের দ্বারা পাইবে।

INCLUSIONS

Oh, wilt thou have my hand dear. to lie along in thine?

As a little stone in a running stream, it seems to lie and pine.

Now drop the poor pale hand, dear, unfit to ply with thine.

Oh wilt thou have my cheek dear, drawn closer to thine own?
My cheek is white, my cheek is worn, by many a tear run down.

Now leave a little space, dear, lest it should wet thine own.

Oh must thou have my soul, Dear, commingled with thy soul?

Red grows the cheek, and warm the hand, the part is in the whole:

Nor hands nor cheeks keep separate, when soul is joined to soul.

Mrs. Browning.

লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য, আইস, তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাদনে অধিষ্ঠান কর। তুমি যাহার হৃদয়ে বিরাজ কর, তাহার আর দারিদ্র্য ভয় নাই; জগতের সর্বাতেই তাহার ঐশ্বর্য।

যাহারা লক্ষ্মীছাড়া, তাহারা হৃদয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ করা।
গৌণকরিয়া। ঠাকুর থলি ও স্থূল উদর বহন করিয়া বেড়ায়। তাহারা অতিশয় দরিদ্র, তাহারা মুকুন্দ মিত্র বাস করে; তাহাদের বাসস্থানে ঘাস জমায় না, তুলনাত নাই, বসন্ত আসে না।

তুমি বিকুচর গোহিনী। জগতের সব্যসাত তোমার মাতৃস্থল। তুমি এই জগতের শীর্ষক কর্তন কক্ষাল প্রকৃত কোমল সৌন্দর্যের ধার। আচ্ছন্ন করিতেছ। তোমার মধুর করুণ বাণীর দ্বারা জগৎ পরিবারের বিরোধে বিদ্ধে দূর করিতেছ। তুমি জননী কি না, তাই তুমি শাসন হিংসা ঈশ্বর। দেখিতে পার না। তুমি বিশ্ব-চরাচরকে তোমার বিকশিত কমল দলের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া অনুপম সুগন্ধে রাখিয়া। রাখিতে চাও। সেই সুগন্ধ এথনি পাইতেছি; অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিতেছি, “কোথায় গে? সেই রাত্রি চরণ দুখানি আমার হৃদয়ের মধ্যে। একবার
লক্ষ্য।

স্থাপন কর, তোমার স্নেহহৃদয়ের কোমল স্পর্শে আমার হৃদয়ের পাষাণ-কাঠনতা দূর কর।
তোমার চরণ-রেণুর সংগ্রামে স্নাতিত হইয়া
আমার হৃদয়ের পুষ্পগুলি তোমার অগ্রে
তোমার স্নোগন্ধ দান করিয়ে থাকেক।

এই যে, তোমার পদমবনের গন্ধ কোথা
হইতে জাগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চরাচর
উদ্ধত হইয়া মধুরের মত দল বাধিয়া। গুন্ধু গুন্ধু
গান করিয়ে করিতে সৃষ্টি আকাশে চারিদিক
হইতে উড়িয়া চলিয়াছে।
কথাবার্তা।

সন্ধ্যাবেলায়।

১ম। আমি সন্ধ্যা। কেন এত ভালবাসি জিজ্ঞাসা করিতেছি?

সমস্ত দিন আমরা পৃথিবীর মধ্যেই থাকি সন্ধ্যাবেলায় আমরা জগতে বাস করি। সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই, পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবী ছাড়াই বেশি—এমন লক্ষ লক্ষ পৃথিবী কুচি কুচি সোনার মত আকাশের তলায় ছড়াছড়ি যাইতেছে। জগৎ মহারণের একটি বৃক্ষের একটি শাখার একটি প্রান্তে একটি অতি ছুড় ফল প্রতিদিন পাকিতেছে। তাহাই পৃথিবী। দিনে দেখিতাম পৃথিবীর মধ্যে ছোট-খোট গাছ-কিছু সমস্তই চলাচল ফিরা করিতেছে। সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই পৃথিবী স্বয়ং চলিতেছে। রেল-
গাছি যেমন পর্বতের খোদিত গুহার মধ্যে 
প্রবেশ করে—তেমনি, পৃথিবী তাহার কোটি 
কোটি আরোহী লইয়া একটি শুদ্ধীর্ণ অঞ্চলকারের 
গুহার মধ্যে যেন প্রবেশ করিতেছে—এবং সেই 
ঘোর নিশীথ-গুহার ছাদের মণ্ডে অর্ঘু গ্রহ- 
তার। একেকটি প্রাণীর ধরিয়া দাঁড়াইয়। আছে— 
তাহারি নীচে দিয়। একটি অর্থ প্রকাশকায় 
গোলক নিঃশেদে অবিশ্বাস গড়াইয়া চলিতেছে। 

২য়। এই বৃহৎ পৃথিবী সত্তা সত্তাই যে 
অসীম আকাশপথচিহ্নহীন পথে অহংকারিত হুহু 
করিয়া চূঁটিয়া চলিয়াছে, এক নিমেষও দাঁড়াইতে 
পারিতেছে না, ইহা একবার মনের মধ্যে অনুভব 
করিলে কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। 

১ম। এমন একটি পৃথিবী কেন—যখন 
মনে করিতে চেঢ়া করা যায় যে, ঠিক এই মুছু- 
জেই অনন্ত জগৎ প্রচৌবেগে চলিতেছে এবং
তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণু থর থর করিয়া কাঁপিতেছে; অতিরিক্ত অতি গুরুভার লঙ্কাকোটি অষ্টত নিযুক্ত চন্দ্র সূর্য তার। এখন উপগ্রহ, উষ্ণ, ধূসরকেতু, লঙ্কা যোজন বাপ্ত নক্ষত্রবাস্পারাশি কিছুই স্বর্ণ নাই; অতি বলিষ্ঠ বিরাট এক যাদু-কর পুরুষ যেন এই অসংখ্য অনল-গোলক লইয়া অনন্ত আকাশে অবহেলে লোকালুকি করিতেছে (কি তাহার প্রকাণ বলিষ্ঠ বাহু। কি তাহার বজ্রকৃষ্ঠ বিপুল মাংসপেশী !) প্রতি পলকেই কি অগ্নি শক্তি বায় হইতেছে—তখন কল্পনা অনন্তের কোনু প্রায় বিদ্যুৎ হইয়া হারাইয়া যায়।

২য়। অথচ দেখ, মনে হইতেছে প্রকৃতি কি শান্ত!

১ম। প্রকৃতি আমাদের সকলকে জানাইতে চায় যে, তোমরাই খুব মন্দ লোক—তোমরা আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছ। বিদ্রুপ্যায়াবিনীকে
তার দিয়া বাঁধিয়াছ—বাঙ্গা-দানবকে লোহ কারাকাঠে বাঁধিয়া তাহার দারা কাজ উদ্ধার করিতেছে। প্রকৃতি যে অতি বৃহৎ কার্য্যগুলি করিতেছে তাহা আমাদের কাছ হইতে কেমন গোপন করিয়া রাখিয়াছে, আর, আমরা যে অতি কৃষ্ণ কাঙ্জের মাথা করি, তাহাই আমাদের চোখে কেমন দেদীপযায় করিয়া দেয়!

২য়। নহিলে, আমরা যদি প্রত্যক্ষ দেখিয়া পাই অন্যের কাজ চলিতেছে, তাহা হইলে কি আমরা আর কাজ করিতে পারি!

১ম। কম কাঙ্জ! বড় হইতে ছোট পর্যায়ত দেখ। অতি মহৎ শক্তিসম্পন্ন কত সহস্র নক্ষত্র লোক, অথচ দেখ, তাহারা ছোট ছোট মানিকের মত কেবল চিক্চিক করিতেছে মাত্র। আমরা ফুলবাগানের মধ্যে বসিয়া আছি মনে হইতেছে চারিদিকে যেন ছুটি। অথচ এতি গাছে
পাতায় ফুলে ঘাসে অবিশ্বাস কাজ চলিতেছে— 
রাসায়নিক যোগ-বিয়োগের ছাট বসিয়া। গিয়াছে, 
কিন্তু দেখ, উহাদের মুখে গলদ্বর্ধ্ম পরিশ্রমের 
ভাব কিছুমাত্র নাই। কেবল সৌন্দর্য, কেবল 
বিরাম, কেবল শান্তি! আমি যখন আরাম করি- 
তেছি, তখনো আমার আপাদমস্তকে কাজ 
চলিতেছে—আমার শরীরের প্রত্যেক কাজ যদি 
মেহসন্ত করিয়া। আমার নিজেকেই করিতে হইত 
তাহা হইলে কি আর জীবন ধারণ করিয়া। সুখ 
থাকিত!

২য়। প্রকৃতি বলিতেছে, আমি তোমার 
জন্য বিশ্বাস কাজ করিয়া দিতেছি আর তুমি কি 
তোমার নিজের জন্য কিছু করিবে না! জড়ের 
সহিত তোমার প্রতিদেহ এই যে, তোমার নিজের 
জন্য অনেক কাজ তোমার নিজেকেই করিতে 
হয়। তুমি পুরুষের মত আহার উপার্জন করিয়া।
আন, তার পরে সেটাকে পাক্ষিকে রাঁধিয়া লই-বার অতি কৌশলসাধ্য কার্য্য তার, সে আমার উপরে রহিল, তাহার জন্যে তুমি বেশী ভাবিও না। তুমি কেবল চলিবার উদ্যম কর, দেখিয়ে আমি তোমাকে চলাইয়া লইয়া যাইব।

১ম। ঠিক কথা, কিন্তু প্রকৃতি কথনে বলে না যে, আমি করিতেছি। আমাদের বেশীর ভাগ কাজ যে প্রকৃতি সম্পন্ন করিয়া দিতেছে, তাহা কি আমরা জানি? আমাদের নিরুদামে যে শতসহস্র কাজ চলিতেছে, তাহা চলিতেছে বলিয়া আমাদের চেতনাই থাকে না। এই যে অতি কোমল ব্যতাস বহিতেছে, এই যে আমার চোখের সমুখে গঙ্গার ছোট ছোট তরঙ্গগুলি মৃদু মৃদু শব্দ করিতে করিতে তটের উপরে মুহূর্তমুহূর্ত লুটাইয়া পড়িতেছে ইহায় আমার হৃদয়ের এই অতি তীব্র শোক অহরহ শান্ত করিতেছে। অগ-
তের চতুর্দিক হইতে আমার উপর অবিশ্রাম সামনা বর্ধিত হইতেছে অথচ আমি জানিতে পারিতেছি না, অথচ কেহই একটি সামনার বাকা বলিতেছে না—কেবল অলক্ষে অদৃশ্যে আমার আহত ছদ্মের উপরে তাহাদের মন্ত্রপূর্ত হাত বুলাইয়া যাইতেছে আহারিতুহুতুকুও বলিতেছে না। আমাদের চতুর্দিকের এই যে কার্য্যকৃত্য সদার্থ বাক্তিগণ গুপ্তভাবে থাকে সে কেবল আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য ; আমাদিগকে জানাইবার জন্য যে আমরাই রাখি।

২য়। অর্থাৎ, অধীনতাখুব প্রাকাং হইলে তাহাকে কতকটা রাধীনতা বলা যাইতে পারে—কারাগার যদি মন্দ হয়, তবে তাহাকে কারাগার না বলিলেও চলে। বোধ করি, আমাদিগকে স্থায়ীরূপে অধীন রাখিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। পাচ্ছে মুহুর্তে আমাদের
চেতনা হয় যে আমরা অধীন, ও বৈরাগ্য সাধনা দারা প্রকৃতির শাসন লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করি, এই ভয়ে প্রকৃতি আমাদের হাত হইতে হাতকড়ি খুলিয়া লইয়া আমাদিগকে একটা বেড়া-দেওয়া জায়গায় রাখিয়া দিয়াছে। আমরা ভুলিরা থাকি আমরা অধীনতার দারা বেষ্টিত, মনে করি আমরা ছাড়া পাইয়াছি।

১ম। কিন্তু এমনও হইতে পারে প্রকৃতি আমাদিগকে স্বাধীনতার শিক্ষা দিতেছেন। দেখ না কেন, উত্তরাত্র কেমন স্বাধীনতারই বিকাশ হইতেছে! জড় যে, সে নিজের জন্য কিছুই করিতে পারে না! উত্তীর্ণ তাহার চেয়ে কতকটা উচ্চ। কারণ টিকিয়া থাকিবার জন্য ধারণিকটা যেন তাহার নিজের উদ্যমের আবশ্যক, তাহাকে রস আকর্ষণ করিতে হয়, বাতাস হইতে আহার্য সংগঠন করিতে হয়। মানুষ এত বেশী স্বাধীন
যে, প্রকৃতি বিস্তর প্রধান প্রধান কাঁটা বিখ্যাত করিয়া। আমাদের নিজের হাতেই রাখিয়া দিয়াছেন। আর, স্বাধীনতা জিনিষ বড় সামান্য নহে। জড়ের কোন বলাই নাই। আমরা, মানুষেরা, কি করিলে যে তাল হইবে, পদে পদে তাহা ভাবিয়া পাই না। আকুল হইয়া একবার এটা দেখিতেছি, একবার ওটা দেখিতেছি; এবং এইরূপ পরীক্ষা করিতে করিতেই আমরা শতসহস্র করিয়া মারা পড়িতেছি। উত্তরাধিকারের যেরূপ স্বাধীনতার বিকাশ হইয়া আসিয়াছে, ইহাই যদি ক্রিয়া চালনা হয়, তাহা হইলে মানুষের পর এমন জীব জন্মাইবে, যাহার কুখ্যা পাইবে না। অথচ বিবেচনা পূর্বর্ক আহার করিতে হইবে (অনেক মানুষ গ্রহণ তাহা করিতে হয়), রক্ত সঞ্চালন ও পরিপাক কার্য্য তাহার নিজের কৌশলে করিয়া লইতে হইবে,
(মানুষের রক্ষন-কার্য্যও কতকটা তাহাই)
ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার শরীরের পরিকল্পিত সাধন করিতে হইবে—এক কথায়, তাহার আপাদ-মুখকের সমস্ত তার তাহার নিজের হাতে পড়িবে। তাহার প্রোত্যেক কার্য্যের ফলকল সে অনেকটা পর্যন্ত দেখিয়া পাইবে। একটি কথা কহিলে আমাদের জনিত বাস্তবের তরঙ্গ কতকবর কত বিভিন্ন শক্তিরূপে রূপান্তরিত হইবে তাহার সে জানিবে, এবং তাহার সেই কথার ভাব সম্বুজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কত জ্ঞানকে কতরূপে বিচলিত করিবে, তাহার ফল পুরুষায়ুক্তমে কত-দূরে কি আকারে প্রবাহিত হইবে তাহার বুঝিতে পারিবে।

২য়। আমাদের স্বাধীনতাও আছে, অধীনতাও আছে, বোধ করি, চিরকালই থাকিবে। স্বাধীনতার যেমন সাধনা আবশ্যক, অধীনতারও
বোধ হয় সেইরূপ সাধনা আবশ্যক। হয়তো উৎকর্ষপ্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ অধীনতাকেই যথার্থ স্বাধীনতা বলে। কেবল মাত্র স্বতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে না। যথার্থ যে রাজা সে প্রকার অধীন, পিতা সন্তানের অধীন, দেবতা এই জগতের অধীন। অর্থাৎ স্বাধীনতায়ে অধীনতাকেই শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে। জড় পদার্থ অধীন তাই অধীন, মানুষেরা অধীন তাই স্বাধীন, আর দেবতারা স্বাধীন তাই অধীন। আমরা যখন মহত লাভ করি, তখন আমরা জগতের দাসত্ব করি, কিন্তু সেই দাসত্ব করাকেই বলে রাজত্ব করা। আর স্বতন্ত্র হওয়াকেই যদি স্বাধীন হওয়া বলে তাহা হইলে স্বদেশতাকেই বলে স্বাধীনতা, বিনাশকেই বলে স্বাধীনতা।
আত্মা।
আত্মগঠন।

সকল দ্বারা, যাহা কিছু নিজের অনুকূল, উপযোগী, তাহাই আপন শক্তি-প্রভাবে চারিদিক হইতে আকর্ষণ করিতে থাকে, বাকী আর সকলের প্রতি তাহার তেমন ক্ষমতা নাই। নিজেকে যথাযোগ্য আকারে ব্যক্তি ও পরিপূর্ণ করিবার পক্ষে যে সকল পদার্থ সর্বাপেক্ষা উপযোগী, উদ্ভিজ্জ-শক্তি কেবল তাহাই জল বায়ু প্রক্রিয়া হইতে গৃহণ করিতে পারে, আর কিছুই না। মানুষের জীবনী শক্তিও কিছুতেই আপনাকে উদ্ভিজ্জ শরীরের মধ্যে ব্যক্তি করিতে পারে না। সে নিজের চারিদিকে এমন সকল পদার্থই সক্রিয় করিতে পারে যাহা তাহার নিজের প্রকাশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। মনের মধ্যে
একটি পাপের সকলে তাহার চারিদিকে সহস্র
পাপের সকলে আকর্ষণ করিয়া আপনাকে আকার-
বদ্ধ করিয়া তুলে ও প্রতিদিন রহৎ হইতে থাকে।
পুণ্য-সকলে ও সেই রূপ। সজ্জিতার ইহাই
লক্ষণ। আমরা যখন একটি প্রবন্ধ লিখি, তখন
কিছু সেই প্রবন্ধের প্রতোক ভাব প্রতোক কথা
ভাবিয়া লিখিতে বসি না। একটি মুখ্য সজ্জাব
ভাব যদি আমার মনে আবির্ভূত হয়, তবে
সে নিজের শক্তি-প্রভাবে আপনার অন্যকুল
ভাব ও শব্দ গুলি নিজের চারিদিকে গঠিত
করিতে থাকে। আমি যে সকল ভাব কোন
ক্লেলেও ভাবি নাই, তাহার পর কোথা হইতে
আকর্ষণ করিয়া আনে। এই রূপে সে একটি
পরিপূর্ণ প্রবন্ধ আকার ধারণ করিয়া আপনাকে
আপনি মানুষ করিয়া তুলে। এই জন্য প্রব-
ন্ধের মস্তিষ্কের মুখ্য ভাবটি যত সচেতন হয় প্রবন্ধ
ততই ভাল হয়; নিজীব তার আপনাকে আপনি
গড়িতে পারে না, বাহির হইতে তাহার কাঠামো
গড়িয়া দিতে হয়। এই নিমিত্ত ভাল লেখা
লেখকের পক্ষেও একটি শিক্ষা। তিনি যতই
অগ্রসর হইতে থাকেন ততই নূতন জ্ঞান লাভ
করিতে থাকেন।

আত্মার সীমা।

আমার মনে হয়, মানুষের আত্মাও এইরূপ
ভাবের মত। তার নিজেকে ব্যক্ত করিতে চায়।
যেটি তাহার নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহ্য বিকাশ
তাহাই আশ্রয় করিতে করিতেই তাহার ক্রমাগত
পুষ্টি সাধন হয়। আমরা মনের মধ্যে যাহা অনু-
ভব করি, কার্য্যই তাহার বাহ্য প্রকাশ। এই
জন্য আমাদের অধিকাংশ অনুভাব কাজ করিবার
জন্য ব্যাকুল, আবার, কাজ যতই সে করিতে থাকে ততই সে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। আমাদের আমারও সেইরূপ সর্বাঙ্গপূর্ণ। অনুকূল অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করিতে চায়। এবং সেই প্রকাশ-চেষ্টা রূপ কর্মেতেই তাহার উপরের পুষ্টিদান হইতে থাকে। চারিদিকের বাতাস হইতে সে আপনার অনুরূপ ভাবনা কামন। প্রস্তুতি আকর্ষণ করিয়া নিজের আবরণ নিজের সীমা নিজে রচনা করিতে থাকে। অবশেষে আর কিছুই উপরে তাহার উত্সুক প্রভুত নাই। আমরা সকলেই বন্ধু বন্ধন ও অবস্থার দারা বেষ্টিত হইয়া একটি যেন ভিড়ের মধ্যে বাস করিতেহি, ঐ ঠুকুর মধ্যে হইতেই আমাদের উপ- যোগী খাদ্য শোষণ করিতেহি। একটি বাক্তি- বিশেষতে যখন আমরা দেখি, তখন তাহার চারি- দিকের মণ্ডলী আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু
তাহার সেই খাদ্যাধার মণ্ডলী তাহার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিত ভাবে ফিরিতেছে। যে ব্যক্তি সৌ-ন্দর্য্যপ্রিয়, সে তাহার দেহের মধ্যে, তাহার চর্ম-বরণ ঢুকের মধ্যে, বাস করে না। সে তাহার চারিদিকের তরুণতার মধ্যে আকাশের জ্যোতির্ক-মণ্ডলীর মধ্যে বাস করে। সে যেখানেই যায় চন্দ্রমূর্ত্যময় আকাশ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, তৃণ-পত্র পুষ্পময়ী বনশ্রী তাহাকে ঘিরিয়া রাখে।

ইহারা তাহার ইল্লিয়ের মত। চন্দ্রান্তর মধ্যে দিয়া। সে কি দেখিতে পায়; কুম্ভকের সৌজন্য ও সৌন্দর্যের সাহায্যে তাহার হস্তাঙ্কের কুশ্চনি নিরুদ্ধ হইতে থাকে। এই মণ্ডলীর বিস্তার লইয়া মানুষের ছোটবড় ছোটবড়। মনুষ্যের যে দেহ মাপিতে পারা যায়, সে দেহ গড়ে পায় সকলেরই সমান। কিন্তু যে দেহ দেখা যায় না, মাপা যায় না, তাহার ছোট বড় সামান্য নহে। এই দেহ, এই মণ্ডলী,
এই বৃহৎ দেহ, এই অবস্থা-গোলক, যাহার মধ্যে আমাদের শাক্ত আত্মার খাদ্য সংক্রিত ছিল, ইহাই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে পরলোকে অমরগ্রহণ করে।

মানুষ চেনা।

যেমন মানুষের বৃহৎ দেহটি আমরা দেখিতে পাই না, তেমনি যথার্থ মানুষ যে তাহাকেও দেখিতে পাই না। এই জন্য কাহারও জীবন-চরিত লেখা সম্ভব নহে। কারণ, লেখকের মানুষের কাজ দেখিয়া তাহার জীবনচরিত লেখেন। কিন্তু যে পোটিকক্ক কাজ মানুষ করিয়াছে তাই তিনি দেখিতে পান, লক্ষ লক্ষ কাজ, যাহা সে করে নাই, তাতে তিনি দেখিতে পান না। আমরা তাহার কতক গুলা কাজের টুকো এখান ওখান হইতে কুড়াইয়া।
ছোড়া দিয়া একটা জীবন-চরিত খাড়া করিয়া তুলি, কিন্তু তাহার সমগ্রটি দেখিতে পাই না। তাহার মধ্যে যে মহাপুরুষ অসংখ্য অবস্থায় অসংখ্য আকার ধারণ করিতে পারিত তাহাকে ত দেখিতে পাই না। তাহার কাজ-কর্মের মধ্যে বরং সে ঢাকা পড়িয়া যায়; আমরা কেবল মাত্র উপস্থিত দেখিতে পাই, যত কাজ হইয়া গিয়াছে, যত কাজ হইবে, এবং যত কাজ হইতে পারিত, উপস্থিত কার্য-খণ্ডের সহিত তাহার যোগ দেখিতে পাই না। আমরা মূহুর্তে মূহুর্তে এক-একটা কাজ দেখিয়া সেই কার্য-কর্মের মূহুর্তে মূহুর্তে এক-একটা নাম দিই। সেই নামের প্রভাবে তাহার বাতি-বিশেষত ঘুচিয়া যায়, সে একটা সাধারণ শ্রেণীর হইয়া পড়ে, মুহূর্তে ভিড়ের মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলি। আমরা রামকে যখন খুনী বলি, তখন সে পৃথিপৃথি-
বীর লক্ষ লক্ষ খুনীর সহিত এক হইয়া যায়। কিন্তু রাম-খুনী ও শ্যাম খুনীর মধ্যে এই খুন
সম্বন্ধেই এমন আকাশ পাতাল প্রভুদ, যে, উভয়কে এক নাম দিলে বুঝিবার সুবিধা হওয়া
দূরে থাকিলে, বুঝিবার ভর্ম হয়। আমরা প্রত্যহ
আমাদের কাছের লোকদিগকে এইরূপে ভুল
বুঝি। তাড়াতাড়ি তাহাদের এক-একটা নাম-
করণ করিয়া ফেলি ও সেই নামের ক্রিম খোলাঘাটার মধ্যেই সে ব্যক্তি ঢাকা পড়িয়া যায়।
অনেক সময়ে মানুষ অনুপস্থিত থাকিলেই
তাহাকে ঠিক জানিতে পারি। কারণ, সকল
মানুষই রুহৎ। রুহৎ জিনিসকে দূর হইতে দেখিলে
ই তাহার সমস্তা দেখা যায়, কিন্তু তাহার
অত্যন্ত কাছে লিঙ্গ থাকিয়া দেখিলে তাহার
খানিকটা অংশ দেখা যায় মাত্র, সেই অংশকেই
সমস্ত বলিয়া ভর্ম হয়। মানুষ অনুপস্থিত
শাখিলে আমরা তাহার দুই চারি বর্তমান মুহুর্তকে মাত্র দেখিনি, যত দিন হইতে প্রথমে জানি, ততদিনকার সমষ্টি সর্বপে তাহাকে জানি।

স্তরাং সেই জানাটই অপেক্ষাকৃত যথার্থ।

পৃথিবীর অধিবাসীরা পৃথিবীকে কেহ বলিবে উঁচু, কেহ বলিবে নীচু। কেহ বলিবে উঁচু-নীচু। কিন্তু যে লোক পৃথিবী হইতে আপনাকে তফাৎ করিয়া সমস্ত পৃথিবীটা কলন। করিয়া দেখে, সে এই সামান্য উঁচুনীচুগুলিকে গ্রাহ্য না করিয়া বলিতে পারে যে পৃথিবী সমস্ত গোলক। কথাটা খাটু সত্য নহে, কিন্তু সর্পিলেক্ষ্য সত্য।

শ্রেষ্ঠ অধিকার।

আত্মার উপরে শ্রেষ্ঠ অধিকার কাহার জমি-যাচ্ছে? যে আত্ম-বিগ্রহন করিতে পারে। নাবলক যে, তাহার বিষয় অশ্রয় সম্পূর্ণ আছে।
বটে, কিন্তু সে বিষয়ের উপর তাহার অধিকার 
নাই—কারণ তাহার দানের অধিকার নাই। এই 
দানের অধিকারই সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। যে ব্যক্তি 
পরের দিয়ে পারে সেই ধনী। যে নিজের পর 
খায় না পরের দিয়ে দেয় না কেবল মাত্র জমাইতে 
থাকে, তাহার নিজের সম্পত্তির উপর কতকটাকিছু আধিকার। যে নিজে খাইতে পারে কিন্তু পরের 
দিয়ে পারে না সেও দরিদ্র—কিন্তু যে পরের 
দিয়ে পারে নিজের সম্পত্তির উপরে তাহার 
সর্বাঙ্গীন অধিকার জমিয়াছে। কারণ, ইহাই 
চরম অধিকার।

আমাদের পুরাণে যে বলে, যে ব্যক্তি ইহার-
জ্ঞানে দান করে নাই সে পরম্পরে দরিদ্র 
হইয়া। জমিনে, তাহার অর্থ এইরূপ হইতে 
পারে যে টাকা ত আর পরকালে সঙ্গে যাইবে না, 
স্তরাং টাকাগত ধনিন্দা বৈতরণীর এ পার
পর্যাপ্ত। যদি কিছু সঙ্গে যায় ত সে হাদয়ের সম্পত্তি। যাহার সমস্ত টাকা কেবল নিজের অন্যা—নিজের গাড়িটি ঘোড়াটির জন্য লাগে, তাহার লাখ টাকা। থাকিলেও তাহাকে দরিদ্র বল। যায় এই কারণে—বে, তাহার এত সামান্য আয় যে তাহাতে কেবল তাহার নিজের পেটটাই চরে, তাও তো ঘরে না গিয়ে! তাহার কিছুই বাকী থাকে ন।—বরং কিছু আসে তাহার নিজের অতি সহজ শুনাত। পুরাইয়ে, অতি রহস্য বুঝিলে দারিদ্র দূর করিতেই খরচ হইয়া যায়। স্বতরাং যখন সে বিদায় হয়, তখন তাহার দেই প্রকাণ শুনাত। ও হাদয়ের দুর্লভ এই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়, আর কিছুই যায় ন। বলে বলে, তের টাকা রাখিয়া মরিল। ঠিক কথা, কিন্তু এক পয়সাও লইয়া মরিল না।
নিষ্কল আত্মা।

স্বতরাং, আত্মকে যে দিতে পারিয়াছে আত্মা সর্বতোভাবে তাহারই। আত্মা ক্রমশই অভি-ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জড় হইতে মনুষ্য-আত্মার অনিঃশ্বাসি; মধ্যে কত কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধান। তেমনি দ্বার্থ-সাধন-তৎপর আদিম মনুষ্য ও আত্মবিন্যাস-রত মহদ্বাষণের মধ্যে কত যুগের ব্যবধান। একজন নিজের আত্মাকে ভালোপ পায় নাই, আর এক জনের আত্মা তাহার হাতে আসিয়াছে। আত্মার উপরে যাহার অধিকার জন্মে নাই, সে যে আত্মাকে রক্ষা করিতে পারিবে তাহা কেমন করিয়া বলিব? সকল মনুষ্য নহে—মনুষ্যদের মধ্যে যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ যথার্থ হিসাবে তাহাদেরই আত্মা আছে। যেমন গুর্জিতক ফল ফলাইবার জন্য শতসহস্র নিষ্কল মুকুলের আব-
আত্মার অমরতা।

আত্মার অমরতার মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়। যে আত্মার তাহা দেখা যায় না, সে আত্মার যতই বর্ণ থাকুক ও যতই গন্ধ থাকুক তাহা বন্ধ। একজন মানুষ কেন� বা আত্মাবিসর্জন করিবে! পরের জন্য নিজেকে কেনইবা কও দিবে! ইহার কি যুক্তি আছে! যাহার সহিত নিতাংসই আমার স্থানের যোগ, তাহাই আমার অবলম্বা আর কিছুর জন্যই আমার মাথাবাধা নাই, এইত ইহ-সংসারের শাস্ত্র। জগতের প্রত্যেক পরমাণুই আর সমস্ত উপেক্ষা করিয়া নিজে টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রাণগণে যুথিতেছে, সন্তান স্থায়িত্বকর্তার একটা
যুক্তি-সঙ্কত অর্থ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই স্বাধীনতার উপরে মরণের অভিশাপ দেখা যায়, কারণ ইহা সীমাবদ্ধ। ঐহিত্যের নিয়ম ঐহিত্যেই অবসান, সে নিয়ম কেবল এইখানেই থাটে। সে নিয়মে যাহারা চলে তাহারা ঐহিত্য অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখিতে পায় না, আর কিছুর উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করে না। কেনই বা করিবে? তাহারা দেখিতেছে, এইখানেই সমস্ত হিন্দু মিলিয়া যায়, অন্যত্র অনুসন্ধানের অবশ্যকই করে না। কিন্তু অমরতা কখন দেখিতে পাই? পৃথিবীর সাথ হইতে উঠিত হইয়া পৃথিবীতেই মিলিয়াই যাইব, এ সন্দেহ কখন দূর হয়? যখন দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে এমন একটি পদার্থ নাই, যে ঐহিত্যের সকল নিয়ম মানে না। আমরা আপনার মুখ চাই না, আমরা আনন্দের সহিত
আত্মবিশ্বাসজনক করিতে পারি, আমরা পরের স্থানের জন্য নিজেকে দুঃখ দিতে কঠর হই না। কোথাও ইহা "কেন" খুঁজিয়া পাই না। কেবল হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারি যে, নিজের স্বাধীন কাতর, সংগ্রাম-পরায়ণ এই জগৎ অভিন্ন করিয়া আর এক জগৎ আছে, ইহা সেই খানকার নিয়ম। স্ত্রীর এই খানেই পরিপালন দেখিতেছি না। চারিদিকে এই যে বস্ত্র-জগতের মোর কারাগার-ভিত্তি উঠিয়াছে, ইহাই আমাদের অন্য কবর-চূমি নহে। অতএব যখন আমরা আত্ম-বিশ্বাসজনক করিতে শিখিলাম, তখন আমাদের ওরুভার ঐহিতিক দেহের উপরে চুটি পাখা উঠিল। পৃথিবীর মাটিতে চলিবার সময় সে পাখাচুটির কোন অর্থ বুঝা গেল না। কিন্তু ইহা বুঝা গেল যে এই পাখা চুটি কেবল মাত্র তাহার শোভা নহে উঁহার কার্য্য আছে। তবে
বাহাদের এই পাখা জম্মায় নাই তাহাদেরও কি আকাশে উঠিবার অধিকার আছে?

স্থায়ীত্ব।

আমাদের মধ্যে যে সকল উচ্চ আশা, যে সকল মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে তাহারাই স্থায়ী, আর যাহারা তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে, তাহাদিগকে কার্য্যে পরিণত হইতে দেয় নাই, তাহারা নষ্ঠ। তাহারা এইখানকারই জিনিষ, তাহারা কিছু সঙ্গে সঙ্গে বাইতেন না। আমার মধ্যে যে সকল নিত্য পদার্থ বিরাজ করিতেছে, তাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না; তাহাদের চারি-দিকে যে জড়ত্বপূর্ণ উপকর হইয়া বিচ্ছিন্ননের মত তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই তোমরা দেখিতেছ। আমার মনের মধ্যে সে ধর্মের আদর্শ বজ্ঞান রহিয়াছে তাহারই
উপর আমার স্বায়ত্ত নিভর করিতেছে। যখন কাঠলোচ্ছনের মত সমস্ত পড়িয়া থাকে তখন ধর্মই আমাদের অনুগমন করে। যাহার আত্মায় এ আদর্শ নাই, দেহের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়। জড়ত্বই তাহার পরিণাম। যে গেছে, সে তাহার জীবনের সার পদার্থ লইয়া গেছে, তাহার যা যথার্থ জীবন তাহাই লইয়া গেছে, আর তাহার ছুদিনের স্থিরতা ছুঁখ, ছুদিনের কাজ-কর্ম আমাদের কাছে রাখিয়া গেছে। তাহার জীবনে অনেক সময়ে আর্জিকার মস্তকের সহিত কালিকার মস্তকের অনৈক্য দেখিয়াছি, এমন কি, তাহার মস্ত একরূপ শুনা গিয়াছে, তাহার কাজ আর একরূপ দেখা গিয়াছে—এই সকল বিরোধ অনৈক্য চঞ্চলতা। তাহার আত্মার জড় আবরণের মত এই খানেই পড়িয়া রহিল, ইহাকে অতিক্রম করিয়া। যে ঐক্য যে অমরতা অধিষ্ঠিত ছিল,
তাহাই কেবল চলিয়া গেল। যখন তাহার দেহ দণ্ড করিয়া ফেলিলাম, তখন এগুলিও দণ্ড করিয়া অশানে ফেলিয়া আসা যাক। তাহার সেই মৃত অনিত্য-গুলিকে লইয়া অনর্থক সমালোচনা করিয়া কেন তাহার প্রতি অসম্মান করি? তাহার মধ্যে যে সত্য, যে দেবতা ছিল, যে ধাকিবে, সেই আমাদের ব্যবহৃত মধ্যে অধিষ্ঠান করুক।
ঈশ্বর কবির গান।

মন্ত্রের সীমান্ত।

এক স্থানে মন্ত্রের প্রান্তদেশ আছে, সেখানে দাঁড়াইলে মন্ত্রের পরপার কিছু কিছু যেন দেখা যায়। সে স্থানটা এমন সকৃত স্থানে অবস্থিত, যে উহাকে মন্ত্রের প্রান্ত বলিব, কি স্বর্গের প্রান্ত বলিব, ঠিক করিয়া উঠা। যায়না—অর্থাৎ উহাকে দুই বলা যায়। সেই প্রান্তভুমি কোথায়! পৃথিবীর আপিসের কাজে শান্ত হইলে, আমরা কোথায় সেই স্বর্গের বায়ু দেবন করিতে যাই।

স্বর্গের সামগ্রী।

স্বর্গ কি, আগে তাহাই দেখিতে হয়। সেখানে যে কেহ স্বর্গ কল্পনা করিয়াছে, সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে স্বর্গের সার বলিয়া অশত অশতের হর্ষ সৌন্দর্যের সার বলিয়া। 

১১
কলনা করিয়াছে। আমার সূর্য আমার সৌন্দর্য-কলনার চরম তীর্থ। পৃথিবীতে কত কি আছে, কিন্তু মানুষ সৌন্দর্য ছাড়া। এখানে এমন আর কিছু দেখে নাই, যাহা দিয়া সে তাহার সূর্য গঠন করিতে পারে। সৌন্দর্য যেন সূর্যের জিনিষ পৃথিবীতে আসি। পাড়িয়াছে, এই জন্য পৃথিবী হইতে সূর্য কিছু পাঠাইতে হইলে সৌন্দর্যকেই পাঠাইতে হয়। এই জন্য সুন্দর জিনিষ যখন ধর্মশ হইয়া যায়, তখন করিবা কলনা। করেন—দেবতারা সূর্যের অভাব দূর করি-বার জন্য উহাকে পৃথিবী হইতে চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। এই জন্য পৃথিবীতে সৌন্দর্যের উৎকর্ষ দেখিলে উহাকে সূর্যচুত বলিয়া গোঁজামিলন দিয়া না লইলে যেন হিসাব মিলানা। এই জন্য, অজ্ঞ ও ইন্দুমতী স্নাযুলোকবাস, পৃথি-বীতে নির্ভারিত।
মিলন।

তাই মনে হইতেছে, পৃথিবীর যে ওপারে স্বর্গের আরন্ত, সেই প্রান্তটিই যেন সৌন্দর্য। সৌন্দর্য মাঝে না থাকিলে যেন স্বর্গে মর্যে চিরবিচেদ হইত। সৌন্দর্যে স্বর্গে মর্যে উত্তর প্রকৃতির চলে—সৌন্দর্যের মাহাত্ম্য তাই, লিঙে সৌন্দর্য কিছুই নয়।

স্বর্গের গান।

শঙ্কায়ে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে না। উহা কানের কাছে ধর, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মর্মমূলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বর্ধির তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর
গান পাখির গানের অতীত আরেকটি গান শুনো। যায়, প্রভাতের আলোকে প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, সুন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্য-মহাদেশের তীরভূমি চোখের সমুদ্রে রেখার মত পড়ে।

মন্ত্যের বাতায়ন।

এই অনেকটা দেখা যায় বলিয়া আমরা সৌ- ন্দর্যকে এত ভালবাসি। পৃথিবীর চারিদিকে দেয়াল, সৌন্দর্য তাহার বাতায়ন। পৃথিবীর আর সকলই তাহাদের নিজ নিজ দেহ লইয়া আমাদের চোখের সমুদ্রে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, সৌন্দর্য তাহা করে না—সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া। আমরা অনন্ত রঙ্গভূমি দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য-বাতায়নে বসিয়া আমরা সুন্দর আকাশের
নৌলিমা দেখি, স্বর্দূর কাননের সমীরণ স্পর্শ করি
স্বর্দূর পুষ্পের গন্ধ পাই, স্বর্গের সূর্য-কিরণ সেই-
খান হইতে আমাদের গৃহের মধ্যে ওবেশ করে।
আমাদের গৃহের স্বাভাবিক অবস্থার দূর হইয়া
যায়, আমাদের হৃদয়ের সঙ্কোচ চলিয়। যায়, সেই
আনলোকে পরম্পরের মুখ দেখিয়া। আমরা পর-
ম্পরকে ভাল বাসিতে পারি। এই বাতায়নে
বসিয়া অন্তর আকাশের জন্য আমাদের ওষ
যেন হা হা করিতে থাকে, দুই বাহি তুলিয়া সূর্য-
কিরণে উড়িতে ইচ্ছ। যায়, এই সৌন্দর্যের শেষ
কোথায় অথবা এই সৌন্দর্যের আরস্ত কোথায়,
তাহারই অবস্থায় স্বর্দূর দিগন্তের অভিমুখে
বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছ। করে, যের যেন আর
মন টেঁকেনা। বাঁশীর শব্দ শুনিলে তাই মন
উদাস হইয়া যায়, দক্ষিণ বাতাসে তাই মনটাকে
টা কোথায় বাহির করিয়া লইয়া যায়।
সৌদর্শ্যলিতে তাই আমাদের মনে এক অদীন আকাশপুরী উদ্দেশক করিয়া দেয়।

সাড়া।

ঘরে মর্ত্যে এমনি করিয়াই কথাবার্তা হয়।
সৌদর্শ্যের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটি ব্যাকুলতা উঠে, পৃথিবীর কিছুতেই সে যেন ভূপতি গায় না। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি আকুল আকাশকার গান উঠে, সর্ব হইতে তাহার যেন সাড়া পাওয়া যায়।

সৌদর্শ্যের দৈর্ঘ্য।

সাহার এমন হয় না, তাহার আজ যদি বা না হয়, কাল হইবেই। আর সকলে বলে দ্বারা অবিলম্বে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে চায়, সৌদর্শ্য কেবল চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে আর
কিছুই করে না। সৌন্দর্যের কি অসামান্য ধৈর্য্য
এমন কতকাল ধরিয়া প্রভাতের পরে প্রভাত
আসিয়াছে, পাখীর পরে পাখী গাহিয়াছে, ফুলের
পরে ফুল ফুটিয়াছে, কেহ দেখে নাই, কেহ শোনে
নাই। যাহাদের ইণ্ডিয়া ছিল কিন্তু অতীণ্ডিয়
ছিল না, তাহাদের সম্মুখেও জগতের সৌন্দর্য
উপেক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন হাসিয়াখে আবিভূত
হইত। তাহারা গানের শব্দ শুনিতে মাত্র,
ফুলের কোটা দেখিতে মাত্র। সমস্তই তাহাদের
নিকটে ঘটনা মাত্র ছিল। কিন্তু প্রতি দিন
অবিশ্রাম দেখিতে দেখিতে, অবিশ্রাম শুনিতে
শুনিতে ক্রমে তাহাদের চক্ষুর পশ্চাতে আরেক
চক্ষু বিকশিত হইল, তাহাদের কর্ণের পশ্চাতে
আরেক কর্ণ উদরাভিত হইল। ক্রমে তাহারা
ফুল দেখিতে পাইল, গান শুনিতে পাইল।
ধৈর্য্যই সৌন্দর্য্যের অন্ত। পুকুরের ক্ষমতা আছে,
তাই এতকাল ধরিয়া রমণীদের উপরে অনিয়ন্ত্রিত
কর্তৃত্বাদি করিয়া আশ্রিত ছিল। রমণীরা আর
কিছুই করে নাই, প্রতিদিন তাহাদের সৌন্দর্যা-
খানি লইয়া ধৈর্য্য সহকারে সহিয়া আশ্রিত ছিল।
অতি ধীরে ধীরে প্রতিদিন সেই সৌন্দর্য জয়ী
হইতে লাগিল। এখন দাঁদু-বল সৌন্দর্য সীতার
গায়ে হাত তুলিতে শিক্ষিত্র্যা উঠে। সভাতা।
যখন বহুদূর অগ্রসর হইবে, তখন বক্ষারে। কেবল-
মাত্র শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতামাটের পূজা
করিবে না। তখন এই স্নেহপূর্ণ ধৈর্য্য, এই আম্বান-
বিশ্রাম, এই মধুর সৌন্দর্য, বিনা উপদেশ
মনুষ্য হইবে আপন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া
লইবে। তখন বিঞ্চুদের গদার কাঞ্চ ঘুরাইবে,
পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে।
জ্ঞানদাসের গান।

পুর্বেই বলিয়াছি, সৌন্দর্যা পৃথিবীতে ফুর্গের বার্তা আনিতেছে। যে বধির, ক্রমশ তাহার বধিরতা দূর হইতেছে। বৈঠক জ্ঞানদাসের একটি গান পাইয়াছি, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া আমার এত কথা মনে পড়িল।

মুরলী করা ও উপদেশ।

যে রক্ষা যে ধর্ম উঠে জানহ বিষয়।
কোন রক্ষা বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন রক্ষা রাধা বলে তাকে আমার নাম।
কোন রক্ষা বাজে বাঁশী সুললিত ধর্ম।
কোন রক্ষা কেকা শেখে নাচে ময়ূরিণী।
কোন রক্ষা রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন রক্ষা কদম্ভ ফুটে হে প্রাণনাথ।
কোন রঙ্খ খড় অতু হয় এককালে।
কোন রঙ্খ নিঃখুবন হয় ফুলে ফুলে।
কোন রঙ্খ কোকিল পুষ্যম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়।
অজ্ঞানসাম কহে হাসি।

“রাধে মোঃ” বোল বাজিবেক বাঁশী।

বাঁশীর স্বর।

সৌন্দর্য্য সূক্ষ্মপের হাতে সমস্ত জগতই একটি বাঁশী। ইহার রঙ্খ রঙ্খ তিনি নিঃখাস পূর্বিক্ষেত্রেন ও ইহার রঙ্খ রঙ্খ নৃত্তন নৃত্তন স্বর উঠিতে ছে। মানুষের মন আর কি ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চায়।
সৌন্দর্য্যকে তাহার আহ্বান গান। সৌন্দর্য্যায় সেই দৈববাণী। কন্নক্ষা ফুল তাহার বাঁশীর স্বর, বসন্ত অতু তাহার বাঁশীর স্বর, কোকিলের পুষ্যম।
তান তাহার বাঁশীর স্বর। সে বাঁশীর স্বর কি বলিতেছে। জ্ঞান্দাস হাসিয়া বুঝিলেন, সে কেবল বলিতেছে, “রাধে, তুমি আমার”—আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্যা অবতূল করঞ্চ আমাদেরই নাম ধরিয়া স্তন্ত্রিত করেন। তিনি বলিতেছেন—“তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস!” এই জন্য, আমাদের চারিদিকে যখন সৌন্দর্যা বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমরা যেন একজন কাহার বিরক্ত কাল হই, যেন একজন কাহার সহিত মিলনের জন্য উৎসর্গ হই—সংসারে আর যাহারই প্রতি মন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয় না। এই জন্য সংসারে থাকিয়া আমরা যেন চির-বিরক্ত কাল কাটাই। কানে একটি বাঁশির শব্দ আসিতেছে, মন উদাস হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারি।
না। কে বাঁশী বাজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল, তাহাকে দেখিতে পাই না; সংসারের সুরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক না কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচূর থাকে।

বিপরীত।

আবার এক এক দিন বিপরীত দেখা যায়।
অর্থ জগৎপতিকে বাঁশী বাজাইয়া থাকে।
তাহার বাঁশী লইয়া তাহাকে থাকে।
আজু কে গো মৃদুলী বাজায়?
এ ত কেতু নহে শানমারায়?
ইহার গৌর বরণে করে আলো,
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল?
ইহার রামে দেখি চিকণ বরণী,
নীল উঠি নীলমণি।